কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান

ডক্টর মরিস বুকাইলী

অনুবাদ ঃ মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস

আরমান বুক হাউস
বাংলাবাজার, ঢাকা

কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান

মূলগ্রন্থ ঃ Quran & Modern Science

লেখক ঃ ডঃ মরিস বুকাইলী
(ফ্রেঞ্চ একাডেমি অব মেডিসিন)

অনুবাদ ঃ মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস
(বহু গ্রন্থের অনুবাদক ও প্রণেতা)

পরিবেশক

আরমান বুক হাউস

৪৫, কম্পিউটার কমপ্লেক্স
২য় তলা ঢাকা- ১১০০

প্রকাশক ঃ
মোঃ জাকারিয়া ফরাজী
আরমান বুক হাউস
৪৫, কম্পিউটার কমপ্লেক্স
২য় তলা ঢাকা- ১১০০

[সর্বস্বত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত]

প্রকাশ কাল ঃ
জানুয়ারী ২০০০ ইং

মূল্য ঃ ৪০.০০ টাকা

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
এস.টি কম্পিউটার
৩৪, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

উৎসর্গ

যুগ-যুগান্তরের জ্ঞানবিজ্ঞান সাধক- ও ইসলাম, মুসলমান, মনুষ্যত্ব ও মানবতার সাধনায় নিবেদিতপ্রাণ মানবজাতির মহান সন্তানদের উদ্দেশে—

যুগে যুগে কালে কালে এ জগতে বড় হল যারা
জীবন নিঙড়ে যারা দিয়ে গেল জীবনের আলো
তাদের কি কোন দিন ভুলে যাবে এই বিশ্ব-ধরা
ধরণীর মনুষেরা যুগে যুগে বেসে যাবে ভালো?
আঘাতে আঘাতে যারা জর্জরিত হল এই ভবে
আঘাত দেয়নি তবু আঘাতের সেই বিনিময়ে,
তাহাদের মহত্বের সেই কথা ইতিহাসে রবে?
মানুষের মন-মাঝে রবে তারা চিরামর হয়ে?
এ জগতে যারা শুধু দিয়ে গেল পেল না কিছুই
তাদের বুকের ভাষা কান পেতে শুনেছে কে কবে?
তবু সে ব্যথিত ভাষা গান হয়ে ঝরে যে নিতুই
ফিনিক্স পাখির সুরে চিরকাল গান গেয়ে যাবে।
শত দুঃখ-ব্যথা সয়ে যুগে যুগে করে যাবে ক্ষমা।
তাতেই শান্তিসুখ— সেই প্রিয়া— সেই অনুপমা।।

—মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস

১ জানুয়ারী ২০০০

প্রকাশকের নিবেদন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

শোকর আলহামদু লিল্লাহ। অল্প কয়েকদিনের চেষ্টায় বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ডক্টর মরিস বুকাইলির 'কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান' নামক গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহর দরবারে শোকর আদায় করছি।

এ জগতে অসংখ্য অগণিত মানুষের মধ্যে অল্পকিছু মানুষ অতীতে ছিলেন, আজো আছেন, ভবিষ্যতেও থাকবেন— যাঁরা সমস্ত রকমের বাধা-বিপত্তি ও দুঃখ কষ্ট সহ্য করেও সত্যের পথে অটল-অনড় ও স্থির থাকেন। ইসলাম, মুসলমান, মনুষ্যত্ব ও মানবতার সেবায় তাঁরা চিরনিবেদিতপ্রাণ। তাঁরাই ইসলামের ন্যায় চিরন্তন সত্যও সুন্দরের সেবার মাধ্যমে জীবন সফল করেন। ইহকাল ও পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পতাকাকে চির সমুন্নত রাখেন। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ডক্টর মরিস বুকাইলি সে রকম একজন জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তি। জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার মধ্য দিয়ে ইসলামের সেবায় নিয়োজিত আছেন। আমরা তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করি। সেই সাথে তাঁর অন্যান্য গ্রন্থাবলীও আমরা প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি।

উভয় বঙ্গের সুধী সমাজে সুপরিচিত কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও অনুবাদক জনাব মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাসকে ধন্যবাদ জানাই। খুব অল্প সময়ের মধ্যে গ্রন্থটির অনুবাদ ও সেই সাথে প্রুফ ও প্রকাশনা সংক্রান্ত সমস্ত সহযোগিতার জন্য তাঁর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গ্রন্থটি পাঠক সমাজে সমাদৃত হলে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে মনে করি।

বিনীত
মোঃ জাকারিয়া ফরাজী

৪৫, কম্পিউটার কমপ্লেক্স ২য় তলা
বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
জানুয়ারী ২০০০

অনুবাদক পরিচিতি

মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস। জন্ম ১০ জানুয়ারি ১৯৬১। বাংলা ভাষায় সুশিক্ষিত মাত্রই স্বশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত মাত্রই সুশিক্ষিত বলে একটি কথা আছে। সমাজে এঁদের সংখ্যা খুবই কম হলেও এঁদেরই একজন হলেন এ গ্রন্থের অনুবাদক মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস। একাধিক বিষয় ও ভাষায় তাঁর স্বচ্ছন্দ পদচারণা। মননশীলতা ও মনস্বিতায় ভরপুর তাঁর মৌলিক রচনাগুলি। গ্রন্থাকারে এর বেশিরভাগ মুদ্রিত না হলেও উভয় বাংলার বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তাঁর অজস্র রচনা। গল্প, কবিতা, রম্যরচনা, ভ্রমণ কাহিনী, উপন্যাস ছাড়াও তাঁর বিষয় ভিত্তিক রচনার পরিমাণ অনেক। সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে অজস্র ধারায় লিখেছেন। সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচনাগুলিতে। বাংলাদেশের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে পড়ানো হয় তাঁর সম্পাদিত ও সুদীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস। সংস্কৃত, হিন্দি ও ইংরেজী ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন একাধিক গ্রন্থঃ 'মির্জা গালিবঃ জীবন ও সাহিত,' 'শায়খ নিজামউদ্দীন আউলিয়াঃ জীবনও কর্ম'; 'প্রিয়নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)' ইত্যাদি তাঁর প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থ। অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলী যা অচিরেই প্রকাশ পাবে তা হলঃ 'শেরশাহ সূরী ঃ জীবন ও কর্ম'; 'কালিদাসের মেঘদূত', 'কাব্য আম পারা' ইত্যাদি অনুবাদ গ্রন্থ; ও উপন্যাস 'যমুনার ধারা বহে' যা উপমহাদেশের পটভূমিকায় বিশেষ রীতিতে লেখা সুবৃহৎ উপন্যাস। 'ছোটদের মহানবী' যন্ত্রস্থ। ডক্টর মরিস বুকাইলীর 'কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান'- সুদীর্ঘ ভূমিকাসহ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত। তাঁর 'ইসলামী সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থখানি প্রকাশের অপেক্ষায়। লেখাই তাঁর জীবন, লেখাই তাঁর জীবিকা।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৭
বিষয়বস্তু	৩৭
কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান	৩৯
কুরআন অধ্যয়নের জন্য বিস্তৃত জ্ঞানের প্রয়োজন	৪১
ব্রহ্মাণ্ড বা মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব	৪৪
জ্যোতির্বিজ্ঞান– প্রকাশ ও গতি	৪৬
পৃথিবী	৪৯
মানব সৃষ্টি	৫৩
কুরআন ও বাইবেল	৫৫
অহীর আলো—পরিচয়	৬০
জীবন কী?	৬০
মানবজাতি	৬০
আল্লাহর পথ	৬১
আল্লাহর প্রকাশ	৬১
শেষ আলো	৬১
সত্যের মানদণ্ড	৬২
প্রিয় পাঠকদের উদ্দেশ্যে	৬৩

ভূমিকা

এক.

কুরআন শরীফের প্রথম কথা 'ইকরা' অর্থাৎ পড়। মহানবীর (সাঃ) দ্বারা সূচিত ইসলাম এবং মুসলিম সভ্যতার শুরুর এই হল প্রথম বাক্য। 'পাঠ কর তোমার সেই প্রভুর নামে যিনি (সবকিছু) সৃষ্টি করেছেন— যিনি একবিন্দু রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন মানুষকে। পাঠ কর, তোমার সেই মহিমময় প্রভুর নামে যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞানদান করেছেন— যিনি অনুগ্রহ করে মানুষকে দান করেছেন অজ্ঞাতপূর্ব জ্ঞান।' ৯৬(১-৫)—এই হল কুরআন অনুসারীদের উদ্দেশ্যে মহিমময় সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রথম বাণী। তাই মুসলমানের সাধনাই হল জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ যা কলমের সাহায্যে দান করেছেন।

মূর্খতার যেমন সীমা-পরিসীমা নেই; জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও তেমনি নেই সীমা-পরিসীমা। মূর্খতার এক নাম অন্ধকার। অন্ধকার ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জগতের জীব অন্ধকারের জীব। তাদের চক্ষু এমনই অন্ধকার যে, আলোর সামনে এলে তারা ধাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় তাদের অন্তরজগৎ যখন আলোকিত হয়, তখন সবকিছুই তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জাহেলিয়া-যুগের আরবের নবী সেই করুণাময় আল্লাহ্র তরফ হতে প্রেরিত সেই সত্যালোকিত মহান নবী যিনি সেই অন্ধকার-কুসংস্কারাচ্ছন্নতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র অহী-বাহক-দূত হযরত জিব্রাইলের (আঃ) মারফৎ মহানবীর (সাঃ) কাছে এই শিক্ষা পৌছে দিলেন। কুরআনের প্রথম বাণী তাই জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে অন্ধকার দূরিভূত করে, জগৎকে সত্যের আলোয় আলোকিত করার আহবান। এই আহ্বানকে নিজের জীবনে প্রতিফলিত করে কুরআনের প্রতিবিম্ব-স্বরূপ সত্যালোকিত, সত্যালোক হতে প্রেরিত মহান নবী (সাঃ) বিশ্বজগতের কাছে পৌছে দিলেন সে বাণী। অন্ধকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন জগতের অভিশপ্ত ও হতভাগ্য মানুষদের কাছে এ আলোকিত বাণী পৌছে দেওয়ার সাধনায় ব্রতী মহান নবী মুহম্মদ (সাঃ) নিজ কর্ম ও সাধনার বলে এক অসাধারণ ঐশী-শক্তির বলে জগতের বহু অসাধ্য কর্ম

সুষ্ঠভাবে সাধন করলেন। জাহেলিয়া-যুগে অন্ধকার-কুসংস্কারাচ্ছন্ন জগতের অজ্ঞ-অশিক্ষিত-অভিশপ্ত মানুষদের মধ্যে আল্লাহ্র প্রথম বাণী 'ইকরা'কে জনগণমানবমনে পৌঁছে দেওয়ার সাথে সাথেই যেন এক অসাধারণ প্রতিক্রিয়া হতে শুরু করল। অসংখ্য কল্পিত দেব-দেবীর প্রতি আত্মসমর্পণ, অন্ধ ও গোঁড়া ধর্ম-বিশ্বাসে অভিশপ্ত আরব-পৌত্তলিকেরা যখন মনুষ্যত্বের সর্বশেষ সীমায় নেমে এলো, 'ইকরা' ডাক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসমুখী এক প্রবল জনস্রোত যেন হঠাৎই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। অন্ধকার থেকে আলোর পথে আসার এ-আহবান বিফলে গেল না। হতচকিত অভিশপ্ত মানুষেরা একবার জানার চেষ্টা করল 'ইকরা' অর্থাৎ পাঠ কর— এ আহবান তো তারা এর আগে আর কখনো শোনেনি। এক আল্লাহ্র আহবান তো সেই কতকাল আগে ঈসা (আঃ) নবী শুনিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু সে ধর্মমতের, ইঞ্জিলের বিশুদ্ধতার অবলুপ্তি তো কতকাল আগেই ঘটে গিয়েছে। তারপর, এমন শ্বাপদ-সঙ্কুল জাহেলিয়াতে আচ্ছন্ন এ মরুভূমিতে স্বর্গের এ মধুময় আহবান! 'আল্লাহ্ একবিন্দু রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন মানুষকে'—সত্যিই তো। আর সেই মহিমময় আল্লাহ্ 'কলমের সাহায্যে জ্ঞান দান করেছেন'—এমন চাঞ্চল্যকর, এমন আলোকিত সত্যবাণী যাঁর উপর প্রচারের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে— না জানি তিনিও বা কত জ্ঞানী! আর আল্লাহ্ তাঁর সেই সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকেই কুরআনের প্রতিবিম্ব তৈরি করলেন। আর তিনিই তো 'অনুগ্রহ করে মানুষকে দান করেছেন অজ্ঞাতপূর্ব জ্ঞান'।

এই হল 'ইকরা' অর্থাৎ পাঠ করার অভূতপূর্ব, অজ্ঞাতপূর্ব জ্ঞান-সাধনার প্রথম আহবান। এ পাঠের অন্ত নেই। আল্লাহ্ যেমন অনন্ত জ্ঞানময়, তিনি যেমন অসীম, তাঁর প্রদত্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সীমাও তেমনি অসীম। সূরা 'লোকমান' এর ২৬ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে'—"পৃথিবীতে যে সকল বৃক্ষ আছে যদি তাহা লেখনী হয় ও সাগর মসী হয়, তৎপর (অন্য) সপ্ত সাগর হয়, তথাপি আল্লাহর বাণী সমাপ্ত হইবে না, নিশ্চয় আল্লাহ্ বিজেতা ও জ্ঞানময়।" (কুরআন শরীফ, অনুবাদ—ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, হরফ, কলিকাতা)-বস্তুতপক্ষেই আল্লাহ্ অন্তহীন, অনন্ত জ্ঞানময়। আর সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মহানবীর (সাঃ) কাছে মহাজ্ঞান-বিজ্ঞানময় মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআন প্রেরণ করেছেন। পবিত্র কুরআনের অন্যস্থানে বলা

হয়েছে,-'পরম করুণাময় আল্লাহ্। তিনিই কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন, তিনিই মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তাকে ভাবপ্রকাশ করতে শিখিয়েছেন।' ৫(১-৪) জাহিলিয়াতের অন্ধকার জগৎ হতে বেরিয়ে তৌহিদবাদের আলোকে মানুষ যখন সর্বশক্তিমান আল্লাহকে পরম করুণাময়রূপে ভাবতে শিখেছে, তাঁরই বাণী পবিত্র কুরআনকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে, তাঁকে সৃষ্টিকর্তারূপে স্বীকার করেছে, তিনিই মানুষকে ভাবপ্রকাশের বাহন ভাষা দিয়েছেন, এই সত্যকে মেনে নেওয়ার সাথে সাথেই মানুষের মনুষ্যত্ব-সাধনা সফল হতে শুরু করেছে। ইহজগৎ ও পরজগতের সুস্পষ্ট জ্ঞান সে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। মানুষের যাবতীয় মানবিক চেতনার সাথে সাথেই জগতে এক মহাবিল্পবের সূচনা হয়েছে। আর এই বিপ্লবের সার্থক নেতৃত্ব দিয়েছেন মহানবী মুহম্মদ (সাঃ)। কুরআন অবতীর্ণ ও জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার সাথে সাথেই মানুষ পশুত্বের স্তর থেকে মনুষ্যত্বের স্তরে পৌঁছে গেল। পশু এবং মানুষের পার্থক্য, পশু অপেক্ষা মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব, বাস্তবিকই জ্ঞানবিজ্ঞানবুদ্ধিচর্চার সাথে সাথেই সে সৃষ্টির সেরা জীব বলে নিজেকে ভাবতে শিখল। এর মূল অনুপ্রেরণা-শক্তি হল পবিত্র কুরআন। জগতে এর সার্থক রূপকার হলেন মহানবী মুহম্মদ (সাঃ)।

ইসলামের ধর্মীয় শিক্ষা হল একত্ববাদ। আর একশত ত্রিশ ফরয হল তার ধর্মীয় বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর এই সঙ্গেই অঙ্গীকৃত হয়েছে মুসলমানের যাবতীয় চেতনা ও ইসলামের যাবতীয় মর্মবাণী। একজন ব্যক্তির খাঁটি মুসলমান হওয়ার সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে তার শ্রেষ্ঠ মানুষ হওয়ার সাধনা। আর প্রত্যেক মুসলমানের সকল চেতনার সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে তার সামাজিক জীবনের প্রশ্ন। আর শ্রেষ্ঠ মানুষ তথা মুসলমানিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তার জ্ঞানবিজ্ঞান সাধনার পবিত্র বিষয়াবলী। কুরআন শরীফ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন— 'যারা ঈমান এনেছে এবং বিশেষ করে যারা জ্ঞান বা শিক্ষা অর্জন করেছে— আল্লাহ্তায়ালা তাদের অনেক উচ্চ-আসনের অধিকারী করবেন।' ৫৮(১১)-এই আয়াত থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর কাছে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার বিষয়টি কী গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবিকই কুরআনের এ মহাবাণী তত্ত্বের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নেই। সর্বাবস্থাতেই জ্ঞানী ব্যক্তিরা জগতে সর্বকালেই সর্বমানুষের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র।

মানবজাতির ইতিহাসে যত যুগের কথা জানতে পারা যায়, দেখা গিয়েছে, সেই সেই যুগের জ্ঞানী ব্যক্তিরাই যুগশ্রেষ্ঠের মর্যাদা পেয়ে জগতের ইতিহাসে অজরামরাব্যয়াক্ষয় হয়ে রয়েছেন। যিনি যে বিষয়েই জ্ঞানী হোন-না-কেন, তাঁর স্থানটি অক্ষয় হয়ে রয়েছে। আমাদের উপমহাদেশের শাস্ত্রেও এই সত্যের প্রতিধ্বনি ঘটেছে। শাস্ত্রকার বলেছেন, "নৃপতি পূজ্যতে দেশে, বিদ্বান পূজ্যতে সর্বত্র"— অর্থাৎ নৃপতি সম্মানিত হন স্বদেশে কিন্তু বিদ্বান সম্মানিত হন সর্বত্রই। কুরআনের এ মহাবাণী সর্বযুগে, সর্বকালে সমানভাবে প্রযোজ্য। এ সত্যের লয় নেই— ক্ষয় নেই। ইসলামে বিজ্ঞ মুসলমান ব্যক্তির শ্রদ্ধা ও সম্মান শুধু ইহজগত-ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; যেহেতু মুসলমানের ক্ষেত্র ইহজগত ও পরজগতে বিস্তৃত, সেহেতু ইহজগত ও পরজগতে তিনি সমানভাবে সম্মানিত। ইসলামের উপর ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করে শিক্ষিত হলে তিনি নিশ্চিতই উচ্চাসনের অধিকারী হবেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁদের উচ্চাসন দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বলাবাহুল্য, প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিই নিজের নিজের মানমর্যাদার কথা স্মরণ করে এ সত্য আন্তরিকভাবে স্বীকার করেন।

পবিত্র কুরআনে প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর জন্য যে জ্ঞান-শিক্ষাকে অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, তার প্রধান কারণ প্রকৃত জ্ঞানী-ব্যক্তির পক্ষেই কুরআনের মহাবাণী অনুধাবন ও হৃদয়-মন দিয়ে আল্লাহর মহিমাকে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব। আল্লাহর প্রতিটি মহিমাই প্রতিটি জ্ঞানী-ব্যক্তির পক্ষে অনুধাবনের বিষয়। ক্ষুদ্র ও বক্রবুদ্ধি ও জ্ঞানে দুনিয়ার সব সত্যকে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এ জন্যই ইসলামে জ্ঞান-শিক্ষার জন্য বার বার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। কুরআন শরীফে সূরা 'আল্-বাক্বারা'র ১৬৪ আয়াতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র অসীম রহমত ও মহিমার কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে— 'নিশ্চয়, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে, রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে যে সব জাহাজ মানুষের লাভের জন্য সাগরে চলাচল করে তাদের মধ্যে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে যে পানি বর্ষণ করে মৃত ভূমিকে জীবিত করেন এবং সকল প্রকার প্রাণী তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, আর বায়ুসকলের প্রবাহের (দিক পরিবর্তনের) মধ্যে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী মেঘের গমনাগমনের মধ্যে জ্ঞানী লোকের জন্য অবশ্যই (খোদার মহিমার) বহু নিদর্শন রয়েছে।" --বলাবাহুল্য,

আল্লাহ অসীম জ্ঞানময়, মহাপরাক্রমশালী, অনন্ত অসীম মহিমময় সৃষ্টিকর্তা। তাঁর এ অনন্ত অপার মহিমার স্বরূপ উপলব্ধির জন্য চাই পর্যাপ্ত জ্ঞানার্জন। কেননা, প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তিদের পক্ষেই আল্লাহ্‌র এই মহিমা উপলব্ধি করা সম্ভব।

দিন এবং রাত্রির অসীম রহস্য কী? কী উদ্দেশ্যেই বা তিনি দিনরাত্রি সৃষ্টি করেছেন, সে কথা গভীর অনুধাবনের বিষয়। জ্ঞানবিজ্ঞানের মহা আকরগ্রন্থ পবিত্র কুরআনে স্থানান্তরে এ রহস্যের কথা অতি সংক্ষিপ্ত অথচ স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআন শরীফে অন্য একটি সূরায় বলা হয়েছে, "নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" ৩ (১৯০)-বলাবাহুল্য, বিজ্ঞান এ বিষয়ে যুগ যুগ ধরে গবেষণা করে চলেছে। যেহেতু পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র সৃষ্টি ও মহিমা অনন্ত ও অসীম, তাই সসীম অর্থাৎ সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী মানুষ যুগ-যুগান্তর ধরে এই মহিমময় রহস্য-সন্ধানে ব্রতী হবে কিন্তু তার জানা-শোনার শেষ কোনোদিনও হবে না। হওয়া সম্ভব নয়; তাই মানুষকে জ্ঞানবিজ্ঞান সাধনায় ব্রতী হয়ে থাকতে হবে চিরকাল।

মানুষের শুধু দুইটি চর্মচক্ষু নিয়ে কারবার নয়। এই চক্ষুদ্বয়ের অন্তরালে রয়েছে জ্ঞানচক্ষু। চর্মচক্ষু দিয়ে যা দেখা যায় না, জ্ঞানচক্ষু দিয়ে তা সহজেই অনুভব ও উপলব্ধি করা সম্ভব। জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনায় যার হৃদয় যত আলোকিত, তার অনুভব ও উপলব্ধির জগৎ তত বিস্তৃত। তাই সাধারণ চক্ষু ও জ্ঞানে মানুষের পক্ষে যে সত্য অনুধাবন ও উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, জ্ঞানচক্ষু দিয়ে তা সহজেই সম্ভব। কুরআন শরীফে অন্যত্র বলা হয়েছে, "আর যখন শান্তি অথবা ভয়ের সংবাদ তাদের নিকটে আসে তখন তারা তা প্রচার করে, যদি তারা রসূল কিংবা তাদের মধ্যে যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তাদের গোচরে আনত, তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে তারা তার যথার্থতা নির্ণয় করতে পারত।" ৪ (৮৩)-অর্থাৎ গভীর জ্ঞান-সমৃদ্ধ মানুষের পক্ষে এ তত্ত্ব, এ সত্য অনুধাবন করা সম্ভব।

সূর্য যেমন তমসাচ্ছন্ন ঘন অন্ধকারের বুকে আলোকমালায় সুসজ্জিত হয়ে অন্ধকার বিদূরিত করে, জ্ঞানও তেমনি মানব-মনের ঘন কুয়াসাচ্ছন্ন

তমসাময় অন্ধকার কুসংস্কার দূরিভূত করে তাকে আলোকিত করে তোলে, তার হৃদয়কে প্রসারিত করে, সত্যের আলো তার তমসাচ্ছন্নতা দূর করে দিয়ে অনন্ত অসীম মহাবিজ্ঞানময় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র স্বরূপ উদঘাটিত করে, তাঁকে চিনতে এবং বুঝতে সহায়তা করে। এমন আলোকিত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যেই কুরআনে উল্লেখিত জ্ঞানানুসন্ধানীদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে। তাই নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে সমগ্র জীবন অতিবাহিত করলেও সে রহস্যের সামগ্রিক উন্মোচন সম্ভব নয়। বস্তুতপক্ষে, এমন আলোকিত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন ঃ

১. "তিনিই দিবসকে রাত্রিদ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে ওদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে" ৭(৫৪)।

২."তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে (বৃষ্টির) সমীরণকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। শেষ পর্যন্ত যখন উক্ত বাতাস সঘন মেঘমালা বহন করে আনে, এটি নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে আমি তো প্রেরণ করি, পরে তা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি। অতঃপর তা দিয়ে সর্বাধিক ফলমূল উৎপাদন করি। এভাবে মৃতকে জীবিত করি যাতে তোমরা শিক্ষালাভ করতে পার।" ৭(৫৭)

৩. " তোমার প্রতিপালক আদমসন্তানের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের সন্তানসন্ততি বার করেন।" ৭(১৭২)

—সূরা 'আরাফ'-এর এই আয়াতত্রয়ে সর্বশক্তিমান মহাবিজ্ঞানময় আল্লাহ্‌র অসীম সৃষ্টি-কৌশলের কথা বলা হয়েছে। বায়ুর মাধ্যমে সঘন মেঘমালা একত্রিত করে কিভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করে তিনি নির্জীব ভূখণ্ডের অন্তঃস্থল হতে তিনি ফলমূল সৃষ্টি করেন অতি-সংক্ষেপে মাত্র কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে তা পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশ করা হয়েছে। অন্ধকার কুসংস্কারাচ্ছন্নতায় পরিপূর্ণ অন্ধতুল্য কপট-মুশরেক তথা নিরীশ্বরবাদী, যারা আল্লাহ্‌র মহিমাকে অস্বীকার করে, এত বড় মহানিদর্শনের পরেও কী তারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে অস্বীকার করে? মানুষ কী তার নিজের সৃষ্টিরহস্য বিস্মৃত হয়ে গিয়েছে? যিনি নির্জীব ভূখণ্ডের বুক চিরে ফলমূল সৃষ্টি করেন, যিনি একবিন্দু অপবিত্র পানি হতে জীবসৃষ্টি করেন, তিনিই কী কেয়ামতের দিন মৃত-মানুষদের জীবিত করতে সক্ষম নন? বাস্তবিকই তাঁর সমগ্র সৃষ্টিই জ্ঞানী-ব্যক্তিদের প্রতি নিদর্শনস্বরূপ। এই জন্যই জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চা প্রত্যেক

নরনারীর জন্য ফরয। যাতে মানুষ অন্ধবিশ্বাস দ্বারা নয়; প্রকৃত জ্ঞানের দ্বারা সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করে।

বাস্তবিকই চন্দ্রসূর্যের নিয়মিত সুশৃঙ্খল গতি ও চলাচলের মাধ্যমে যে দিনরাত্রি হয়, সেই দিনরাত্রির সঙ্গেই সমগ্র সৃষ্টিকুলের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে স্পষ্ট বলা হয়েছে।

১. "তিনি সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং ওর তিথি নির্দিষ্ট করেছেন যাতে তোমরা বছর গণনা ও কাল-নির্ণয়ের জ্ঞান লাভ করতে পার। আল্লাহ এ নিরর্থক সৃষ্টি করেন নি। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এ সমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন।" ১০ (৫)

২. "দিন ও রাতের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ আকাশমণ্ডলীও পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাতে সাবধানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" ১০ (৬)

পবিত্র কুরআনের সূরা 'ইউনুস'-এর এই আয়াতদ্বয়ে করুণাময় পরম দয়ালু সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র চন্দ্রসূর্যসহ সৃষ্টি-সংক্রান্ত মহিমা প্রকাশ পেয়েছে যা প্রত্যেক চক্ষুবিশিষ্ট মানুষ বাস্তব জীবনে তা সহজেই অবলোকন করতে পারে। বাস্তবিকই মানবসভ্যতা, মানবজাতি তথা সমগ্র সৃষ্টি চন্দ্রসূর্যের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করতে পারেনা। সূর্য শুধু আলোর উৎস নয়, সূর্য সকল শক্তির উৎস। চন্দ্র শুধু একটি জ্যোতির্ময় সৃষ্টি নয়, পৃথিবী তথা জীবজগতের কল্যাণে নিয়োজিত থাকার পিছনে স্রষ্টার অপার মহিমা সেখানে সর্বদা ক্রিয়া-রত। চন্দ্রসূর্য ছাড়া কালের গতি মাপা সম্পূর্ণ অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে, সূর্য ও চন্দ্রই সময়-কাল-বছর প্রভৃতি গণনার একমাত্র পরিমাপকৃত সময় ও তদনুযায়ী দিন, মাস ও বৎসর গণনাই সৌরবর্ষরূপে পরিচিত। আবার চন্দ্রের গতিবিধি পরিবর্তন-বিবর্তন, পরিবর্ধন-পরিবর্জনানুসারে সময় ও কাল গণনানুসারে সময়-মাপক ও সময়-জ্ঞাপকই চান্দ্রদিবস, চান্দ্রমাস ও চান্দ্রবর্ষরূপে পরিচিত ও বিবেচিত। চন্দ্র এবং সূর্যের দিনকাল নির্ণয় ও পরিমাপকদ্বারাই জগতের মানুষের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালিত হয়ে থাকে। জোয়ার-ভাঁটা, মেঘ-বৃষ্টি, এক কথায় জগৎ ও জীবনের যাবতীয় প্রয়োজনাদি চন্দ্রসূর্যের আবর্তন-বিবর্তনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। বাস্তবিকই, একথা স্পষ্টতই সত্য যে, 'জ্ঞানী-সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এ সমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন

এবং 'সাবধানী' সম্প্রদায়ের জন্য, আবশ্যই তা 'নিদর্শন' স্বরূপ।

১. "তিনি দিবসকে রাত্রিদ্বারা আচ্ছাদিত করেন। এতে অবশ্যই চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। ভূমির পরস্পর অংশ সংলগ্ন, ওতে আছে দ্রাক্ষাকানন, শস্যক্ষেত্র,একাধিক শির বিশিষ্ট অথবা একশির বিশিষ্ট খর্জুরবৃক্ষ, ওদের একই পানি দেওয়া হয় এবং ফলের হিসেবে ওদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি। অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন।" ১৩ (৪)

২. "(বৃষ্টির প্লাবনের পর) যা আবর্জনা তা ফেলে দেওয়া হয় এবং যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে থেকে যায়।" ১৩ (১৮)—সূরা 'রাদ' এর এই আয়াতদ্বয়ে পরম করুণাময় স্রষ্টা সর্বশক্তিমান আল্লাহ 'চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য' এই নিদর্শনগুলির কথা স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করেছেন। যাদের সুসংস্কৃত, সুপরিশীলিত আলোকিত মন ও হৃদয় নেই, এ অপার মহিমা ও গুণাবলীর কথা তাদের পক্ষে অনুভব ও উপলব্ধি করা একেবারেই কী সম্ভব? এই জন্যই তো জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার জন্য এতশত তাগিদ। আর সত্যই তো, যার হৃদয় প্রসারিত নয়, যার সত্যদৃষ্টি বিস্তৃত ও আলোকিত নয়, কেমন করে সম্ভব এ সত্য, এ অপার মহিমাকে উপলব্ধি করা? রাত্রির আচ্ছাদন, ভূমির পরস্পর অংশ-সংলগ্নতা; 'দ্রাক্ষাকানন; 'শস্যক্ষেত্র' 'খর্জুরবৃক্ষ' 'পানি' মানুষের জন্যই তো সব। 'বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য' এতে যি নিদর্শন রয়েছে কোনো জ্ঞানী-গুণী মানুষের পক্ষে তা কোনোদিনই বর্ণনা দিয়ে শেষ করা সম্ভব? জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণার দ্বারাই তো এসব সত্যকে উপলব্ধি করা সম্ভব। বৃষ্টির প্লাবনের পর পর আবর্জনাই তো জমি থেকে সরে যায় আর জমির উর্বরা-শক্তির জন্য ফসল ফলানোর ক্ষেত্রে যা মানুষের উপকারে আসে তাই-ই তো জমিতে থেকে যায়। এ সত্য অস্বীকার করার শক্তি কার আছে?

১. "পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করেছি, আমি পৃথিবীতে অনেক বস্তু সুপরিমিতভাবে সৃষ্টি করেছি, ১৫ (২০)

২. ওতে(পৃথিবীতে) তোমাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা আর তোমরা যাদের জীবিকাদাতা নও তাদের জন্য।" ১৫(২০)

৩. "প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার আমার নিকট আছে এবং আমি তা প্রয়োজনীয় পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি।" ১৫(২১)

৪. "আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, অতঃপর আকাশ হতে বারি বর্ষণ করি..... ১৫(২২) .... সূরা 'হিজর'-এর আয়াত চতুষ্টয়ে সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহর অসীম সৃষ্টিমহিমার কথা বলা হয়েছে। ইসলামী সৃষ্টি-দর্শনে বলা হয়েছে, পৃথিবী সৃষ্টির পরে, তা দুলতে থাকে। তাকে সুদৃঢ়রূপে অবস্থান করানোর জন্য পর্বতমালা স্থাপন করা হয়েছে। আর প্রত্যেক বস্তু 'সুপরিমিতভাবে' সৃষ্টি করা হয়েছে। আধুনিক জ্ঞান—বিজ্ঞানও প্রত্যেক বস্তুর সুপরিমিততাকে মেনে নিয়ে কুরআনের মহাবাণীর মহাসত্যকে স্বীকার করে নিয়েছে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবজন্তু থেকে শুরু করে পৃথিবীর বৃহত্তর যত জীবজন্তু আছে তাদের আহার-সংস্থান বা জীবিকা তিনি প্রতেকের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। কোন মানুষ মানুষের জীবিকাদাতা?- মানুষের হিংস্রতা, হৃদয়হীনতা, মনুষ্যত্বহীনতার কারণে কোনো মানুষ না খেয়ে মরতে পারে, এর বাইরের বিশাল জগতে খোদার রাজত্বে কেউ না খেয়ে মরে না।

তাছাড়া, প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার সেই মহাস্রষ্টার কাছে রয়েছে, তিনি অবশ্যই তা প্রয়োজনীয় পরিমাণে সরবরাহ করেন। তিনি তো অহঙ্কারী বা দাম্ভিক নন যে, তাঁর ভাণ্ডারের অফুরন্ত সম্পদ তিনি অপচয় করবেন। তিনি তো অবশ্যই 'বৃষ্টিগর্ভ বায়ু প্রেরণ' করেন, যা 'বারি বর্ষণ' করে। পৃথিবীকে সুজলা সুফলা করে শ্যামল শস্যে ভরিয়ে দেন। সব বায়ুতে বৃষ্টি হয় না। তাহলে মরুভূমিতেও বৃষ্টি হতো। ফলে, মরুভূমিও থাকত না। বৃষ্টিগর্ভ, সুশীতল এবং ভারী বায়ু, যার গর্ভে বৃষ্টি অবস্থান করে, পৃথিবী এবং জীবকুলের প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় বারি বর্ষিত হয়। তাঁর এই অপরিসীম এবং অপার মহিমাকে একমাত্র সত্যালোকিত হৃদয় ও জ্ঞানচক্ষুবিশিষ্ট বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের পক্ষেই অনুভব ও উপলব্ধি করা সম্ভব। এ কথা অবশ্যই সত্য এবং মহাসত্য যে, মানুষের চর্মচক্ষুর অতীত আরো অসংখ্য সৃষ্টি সেই বিজ্ঞানময় মহান প্রভু, গাফরুর রাহিম আল্লাহ করে রেখেছেন, যা সসীম ও সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী মানুষ অবগত নয়।

কুরআন শরীফ শুধু ধর্মগ্রন্থ-মাত্র নয়, বাস্তবিকই তা মহাবিজ্ঞানময়

গ্রন্থ। ইহকাল-পরকাল, সৃষ্টি ধ্বংস, স্বর্গ-নরক তথা জীবন ও জগতের হেন দিক নেই যা তাতে নেই। তার প্রত্যেকটি আয়াত, প্রত্যেকটি শব্দের রয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুগভীর অর্থ ও পরিব্যাপ্তি। তা প্রত্যেকটি জ্ঞানী-গুণীজনের গভীর চিন্তার বিষয়। বাস্তবিকই কোনো একজন মহাজ্ঞানী ও গুণীজনের পক্ষে তার তত্ত্ব ও মর্মোদ্ঘাটন কখনোই সম্ভব নয়। এত বিচিত্র বিষয়সমৃদ্ধ জ্ঞানবিজ্ঞানের সীমাহীন রাজ্যে মানুষ যে পথ হারাবে তা আর বিচিত্র কী? এ জন্য বহু বিষয়ের, বহু জনের সত্যসাধনা, চর্চা ও গবেষণার দ্বারাই বহু বিষয়ের মর্মোদঘাটন সম্ভব। অতীত-বর্তমান, ইহকাল-পরকাল, প্রভৃতি অসংখ্য বিষয় সম্বন্ধে জানার জন্য পবিত্র কুরআন মানুষকে বারবার তাগিদ দিয়েছেন। সূরা 'আলে ইমরান'-এর ১৩৭ আয়াতে বলা হয়েছে, — "অতীতে তোমাদের পূর্বে বহু বিধান ছিল, সুতরাং তোমরা পৃথিবী পরিভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যাশ্রয়ীদের কী পরিণাম।"—বাস্তবিকই শুধু পঠন—পাঠন আর গতানুগতিক জ্ঞান চর্চার কথা ইসলাম বলেন নি; পবিত্র কুরআনের এই আয়াত তার সর্বপ্রকৃষ্ট উদাহরণ। তত্ত্ব এবং হাতে কলমে (Theoretical & Practical) প্রমাণের তাগিদ তাকে স্পষ্ট ভাষায় দেওয়া হয়েছে। ভ্রমণের দ্বারা শিক্ষালাভ, জ্ঞান—বিজ্ঞান শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্যতম অঙ্গ। Travelling is a part of Education — ইসলামের এই মহান বাণীরই প্রতিধ্বনি।

দুই.

'পাঠ কর, তোমার সেই প্রভুর নামে যিনি (সবকিছু) সৃষ্টি করেছেন—যিনি একবিন্দু রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন মানুষকে। পাঠ কর তোমরা সেই মহিমময় প্রভুর নামে যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞানদান করেছেন—যিনি অনুগ্রহ করে মানুষকে দান করেছেন অজ্ঞাতপূর্ব জ্ঞান।'—৯৬(১-৫)

'পরম করুণাময় আল্লাহ্। তিনিই কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন, তিনিই মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তাকে ভাবপ্রকাশ করতে শিখিয়েছেন।' —৫৮(১১)

'তোমরা যা পছন্দ করনা সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং

তোমরা যা পছন্দ কর সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। ২(২১৬)। [কেননা আল্লাহ অজ্ঞাত জ্ঞানের খনি]

'অতীতে তোমাদের পূর্বে বহু বিধান ছিল, সুতরাং তোমরা পৃথিবী পরি-ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যাশ্রয়ীদের কি পরিণাম।' ৩(১৩৭) (Traveling is a Part of Education)।—আল্-কুরআন।

* প্রথম জ্ঞান আল্লাহ তা'লাকে জানা এবং শেষ জ্ঞান তাঁর প্রতি সর্ববিষয়ে আত্মসমর্পণ করা।—সগির।

* আল্লাহ্ তা'লার কাছে জ্ঞান-সাধকের কলমের কালি শহীদের রক্ত অপেক্ষা অধিক প্রিয়। কারণ জ্ঞানী আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে পথপ্রাপ্ত হয়েছে আর তার দ্বারা আল্লাহ্র অনেক বান্দা পরিচালিত হয়েছে; কিন্তু শহীদ শুধু আপন আত্মার মুক্তি অর্জন করেছে।—ওসিয়াতুন্নবী।

* রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে উপদেশ ও জ্ঞান দিয়ে আল্লাহ্ আমাকে পাঠিয়েছেন তার উপমা হল—মাটির ওপরে বর্ষণ-মুখর প্রবল বৃষ্টি। কিছু মাটি ভাল, (সে মাটি) পানি শুষে নেয় এবং প্রচুর ঘাস-পাতা উৎপন্ন করে, কিছু মাটি শক্ত, (তারা) পানি ধরে রাখে-এবং আল্লাহ তাদের দ্বারা মানুষের কল্যাণ সাধন করেন; তারা পান করে, পান করায় এবং কৃষি করে; এবং ঐ সৃষ্টির কিছু (পানি) এমন এক অঞ্চলে (অর্থাৎ মাটিতে) বর্ষিত হয় যে যদিও তা (সে মাটি) সমতল তবুও তা না ধরে রাখে পানি, না উৎপন্ন করে ঘাস। এই হল ঐ (প্রথম দু শ্রেণীর) লোকের উপমা যারা খোদার ধর্মে জ্ঞানবান হয় এবং খোদা আমাকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দ্বারা লাভবান হয়, শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়। আর ঐ (শেষোক্ত অকেজো মাটির বা) লোকের উপমা হল যে ব্যক্তি ওর (খোদার ধর্মের) দিকে মাথা তুলে তাকায় না এবং আমাকে যে উপদেশ দিয়ে পাঠান হয়েছে-তা গ্রহণ করে না।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু মুসা (রাঃ)।

* ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি যখন নিদ্রিত ছিলাম তখন আমাকে এক পেয়ালা দুধ দেওয়া হল। আমি পান করলাম এবং দেখলাম যে, আমার নখে নখে তৃপ্তি প্রকাশিত হচ্ছে। তারপর বাকিটা ওমর ইবনে খাত্তাবকে দিলাম। তারা (সাহাবীরা) বলল, 'আপনি ওর কি অর্থ করলেন?' তিনি বললেন, 'জ্ঞান'।

[অর্থাৎ জ্ঞান বা সৎ-শিক্ষা দুধের মত এমন এক পবিত্র ও পরম পুষ্টিকর জিনিস যা গ্রহণ করতে পারলে মানুষের দেহমনের কানায় কানায় সার্থক আনন্দের শিহরণ জাগে।]—বুখারী।

* রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন যখন তাঁর মসজিদের মধ্যে দুই দলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন বললেন ঃ তাদের উভয় দলই সৎকার্যে লিপ্ত —তবে একদল অপর দল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ, এরা (উপাসকেরা) আল্লাহ্‌কে ডাকে, তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়, তারপর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন এদের (প্রার্থনা) পূরণ করেন এবং যদি ইচ্ছা না করেন তবে তা প্রত্যাখ্যান করেন; আর এরা (জ্ঞানীরা) ধর্মশাস্ত্র বা জ্ঞানশিক্ষা করেন এবং অশিক্ষিতদের শিক্ষা দেন, অতএব এঁরা শ্রেষ্ঠতর। আমি শুধু শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি। তারপর তিনি তাদের (জ্ঞানীদের) মধ্যে বসলেন।—মিশকাত। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ)।

* রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে দুজন লোক (সম্পর্কে) আলোচনা করা হল—তাদের একজন সাধক আর একজন শিক্ষক (আলেম)। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ একজন সাধক অপেক্ষা একজন শিক্ষকের মর্যাদাও তেমনি অধিক। যে ব্যক্তি মানুষকে ভাল কথা (অর্থাৎ জ্ঞান) শিক্ষাদান করে—তার জন্যে আল্লাহ, আল্লাহর ফেরেশ্‌তারা, আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীরা, এমন কি গৃহবাসী পিপীলিকা এবং মৎস্যেরাও শুভকামনা (দোয়া) করে। —তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আবূ উমামা বাহেলী (রাঃ)।

* শয়তানের কাছে সহস্র সাধক অপেক্ষা একজন শিক্ষক (আলেম বা জ্ঞানী) অধিক আশঙ্কার কারণ।— তিরমিজী। ই. মাজা। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ)।

* জ্ঞানীর নিদ্রা অশিক্ষিত ব্যক্তির উপাসনা অপেক্ষা উত্তম; কারণ জ্ঞান ব্যতীত উপাসনা বিক্ষিপ্ত ধুলিরাশির মত এবং সংযম ব্যতীত জ্ঞান ঝড়ের দিনে ঝঞ্ঝা-তাড়িত ভস্মের মত।—ওসিয়াতুন্নবী।

* শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ব্যতীত কেউ আমার আপন নয়।—সগির।

* যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষণের পথে যাত্রা করে আল্লাহ তাকে বেহেশ্‌তের পথে পৌঁছে দেন এবং ফেরেশ্‌তারা জ্ঞানান্বেষণকারীদের সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে (তাদের চলার পথে) নিজ নিজ ডানা বিস্তার করে দেন। এ ছাড়া

স্বর্গমর্ত্যের সকল কিছু এমন কি পানির মধ্যে মাছেরাও জ্ঞানীদের জন্য প্রার্থনা করে। তারকারাজি মধ্যে পূর্ণচন্দ্র যেমন শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানহীন সাধকবৃন্দের মধ্যে জ্ঞানিগণও তেমনি উৎকৃষ্ট। নবীগণ স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রার পরিবর্তে জ্ঞানের উত্তরাধিকার রেখে যান। যারা জ্ঞান লাভ করে তারা পূর্ণমাত্রায় সেই উত্তরাধিকারের অধিকারী হয়। —আহমদ। আ, দাউদ।ই.মাজা। মিশ।

* আল্লাহ্ তা'লা সেই ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন যে আমার কোন কথা শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে সেইভাবেই তা অপরকে পৌছে দিয়েছে। কেননা, অনেক সময় যাকে পৌছে দেওয়া হয় যে শ্রোতা অপেক্ষা অধিক রক্ষাকারী হয়। —তির। মিশ। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)।

* কোন ব্যক্তিকে তার জানা বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে যদি সে তা গোপন করে তবে কেয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেওয়া হবে। —তির। মিশ। আহমদ। আ. দাউদ। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

* জ্ঞান শিক্ষা কর এবং মানুষকে শিক্ষা দাও, ফরজ কাজগুলো শিক্ষা কর এবং মানুষকে শিক্ষা দাও, আর কুরআন শিক্ষা কর এবং মানুষকে শিক্ষা দাও। কারণ আমি মানুষ, মরণশীল—এবং শীঘ্রই জ্ঞানও লোপ পাবে এবং বিপদ এমন চরম সীমায় উপস্থিত হবে যে ফরজ বা অবশ্য পালনীয় বিষয় সম্বন্ধে দুই ব্যক্তি পরস্পরের মধ্যে বিরোধ করবে এবং তাদের মীমাংসা করার মত কাউকেও পাবে না।—মিশকাত। বর্ণনায় ঃ ইবনে মসউদ (রাঃ)।

* পরবর্তী বংশধরদের জন্য জ্ঞানকে লিপিবদ্ধ করে স্থায়ী' কর।—ওসিয়াতুন্নবী।

* কুলেখক কুকর্মীর তুল্য।—সগির।

* মূর্খদের মধ্যে শিক্ষার্থী মৃতদের মধ্যে জীবিতের তুল্য।—সগির।

* শিক্ষার্থী ইসলামের স্তম্ভ।—সগির।

* যে শিক্ষার্থী জ্ঞানান্বেষণের জন্য বিদেশে গমন করে আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে উন্নত স্থান নির্দেশ করবেন এবং তার প্রতিটি পদক্ষেপ আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয় ও তার শিক্ষা করা প্রতিটি শব্দ পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়।—ওসিয়াতুন্নবী।

* প্রত্যেক বস্তু লাভ করার পথ আছে— বেহশ্‌ত লাভের পথ জ্ঞানান্বেষণ।—সগির।

* জ্ঞান অন্বেষণ কর যদিও তা চীন দেশে থাকে। —মিসবাহোশ্‌শারিয়ত।

* যে জ্ঞানান্বেষণ করে সে পুরস্কৃত হয়, কারণ এ তার দোষগুলোকে গোপন রাখে।

* যে জ্ঞানান্বেষণ করে, সে আল্লাহকে অন্বেষণ করে।—সগির।

* জ্ঞানান্বেষণ আল্লাহর কাছে নামাজ, রোজা, হজ্জ ও জেহাদ অপেক্ষা অধিকতর পুণ্যজনক।—সগির।

* যে ব্যক্তি ইসলামকে জীবন্ত করার জন্য জ্ঞানান্বেষণে মৃত্যুবরণ করে সে নিশ্চয়ই বেহশ্‌তে পয়গম্বরদের একধাপ নীচে থাকবে।—মিশকাত।

* রসূলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'লা আমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছেন যে, যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষণের উদ্দেশ্যে পথ চলে আমি তার জন্য বেহশ্‌তের পথ সহজ করে দিই এবং যাকে আমি (অত্যধিক জ্ঞানানুশীলনের জন্য) অন্ধ করি, আমি তার দুই চক্ষুর পরিবর্তে বেহশ্‌ত দান করি এবং অত্যধিক উপাসনা অপেক্ষা অত্যধিক জ্ঞানান্বেষণ উৎকৃষ্টতর এবং আল্লাহ তা'লাকে ভয় করাই ধর্মের মূল।—বায়হাকী। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

* যে ব্যক্তি জ্ঞান-অন্বেষণের উদ্দেশ্যে বিদেশে গমন করে, আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য বেহেশ্‌তের পথ সহজ করে দেন এবং মানুষ যখন আল্লাহর কোন ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর গ্রন্থ পাঠ করে এবং তার ব্যাখ্যা বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করে তখন তাদের ওপর করুণা ও শান্তি বর্ষিত হয় এবং ফেরেশতারা চারদিক দিয়ে তাদের অভিনন্দন জানায় এবং আল্লাহ তাঁর কাছে অবস্থানকারী ফেরেশ্‌তাদের কাছে তাদের কথা উল্লেখ করেন। যে ব্যক্তি (জ্ঞানান্বেষণের) কাজে অমনোযোগী, বংশমর্যাদা তার কোন কাজে আসে না।—মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

* যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষণে বহির্গত হয়, (স্বগৃহে) প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত সে আল্লাহর পথে থাকে।—তির। মিশ। দারেমী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

জ্ঞান-অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরজ (অবশ্য কর্তব্য) এবং যে অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে জ্ঞান দান করে সে শূকরের গলায় পদ্মরাগমণি, স্বর্ণ বা মুক্তামাল্য স্থাপন করে।— মিশ। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

* সমস্ত মানুষ সোনা-রূপার বিভিন্ন খনির মত—যারা জ্ঞানী অন্ধকার যুগেও তারা উত্তম ঐসলামিক যুগেও তারা উত্তম।—মিশ। মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

* যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষণের উদ্দেশ্যে বহির্গত হয় তার অতীত পাপ মার্জনা করা হয়।—তির। মিশ্।

* শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ কর।—চেহেল হাদীস।

* শৈশবে জ্ঞানার্জন করা প্রস্তরে খোদাই করা লিপির তুল্য, আর বার্ধক্যে জ্ঞানার্জন করা পানির ওপর অঙ্কনের তুল্য।—সগির।

* বিদ্যা ও অর্থ সমস্ত দোষ অপহারক এবং অজ্ঞতা ও দারিদ্র সমস্ত দোষ প্রকাশক।—সগির।

* জ্ঞান হল সত্যকার মুসলমানদের বন্ধু, বুদ্ধি তার সহচর, কর্ম তার পথ প্রদর্শক, অধ্যবসায় তার মন্ত্রী, সহিষ্ণুতা তার সেনাপতি, বিনয় তার সন্তান এবং ভদ্রতা তার সহোদর।—সগির।

* পরিমিত ব্যয় অর্ধেক পাথেয়, মানুষকে ভালবাসা অর্ধেক বুদ্ধির পরিচয়—এবং উত্তম প্রশ্ন অর্ধেক জ্ঞান।

* জ্ঞান হল রত্নাগার এবং প্রশ্ন তার চাবি।—সগির।

* হজরত আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন— জিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ কোরবানীর দিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) মিনার ময়দানে আপন উটের পিঠে বসে ভাষণ দিচ্ছিলেন; আমি তাঁর উটের লাগাম ধরে দাঁড়িয়েছিলাম। প্রথমে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আজকের দিনটা কোন দিন? নবী (সাঃ)-এর এ প্রশ্ন শুনে আমরা সবাই নীরব নিস্তব্ধ হয়ে ভাবতে লাগলাম, বোধহয় এই দিনের প্রচলিত প্রসিদ্ধ নাম 'ইয়াওমুন্নহর' (কোরবানীর দিন) বদলে দিয়ে তিনি অন্য কোন নাম রাখবেন। তাই আমরা মূল প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললামঃ আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল সবচেয়ে ভাল জানেন। তখন নবী

(সাঃ) বলেলেন ঃ এদিনটা পবিত্র ইয়াওমুন্নহর নয়কি'?আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম ঃ হ্যাঁ,—এ পবিত্র ইয়াওমুন্নহর। তারপর নবী (সাঃ) আবার জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এ মাসটা কোন মাস? আমরা সবাই পূর্ববৎ নীরব নিস্তব্ধ রইলাম এবং মনে মনে ভাবতে লাগলাম—বোধ হয় নবী (সাঃ) এ মাসের প্রচলিত নাম পরিবর্তন করে দেবেন। তাই আমরা এবারও বললাম ঃ আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত আছেন। তখন নবী (সাঃ) বললেন ঃ এটা পবিত্র জিলহজ্জ্ মাস নয় কি? আমরা সমস্বরে বললাম ঃ হাঁ, এ সেই পবিত্র মহান জিলহজ্জ মাস। তৃতীয় বার নবী (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এ কোন্ এলাকা? এবারেও আমরা পূর্বের মত ভাবলাম এবং কিছুক্ষণ নীরব থেকে পূর্ববৎ নিবেদন করলাম। তখন নবী (সাঃ) নিজেই বললেন ঃ এ পবিত্র হেরেম শরীফ নয় কি? আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম ঃ হাঁ হাঁ এ সেই পবিত্র হেরেম শরীফ এলাকা। এইভাবে শ্রোতৃবর্গের মনকে (নানা প্রশ্নে মাধ্যমে) পূর্ণরূপে আকর্ষণ করে এবং তাদের হৃদয়ে একাগ্রতা ও পূর্ণ শ্রদ্ধা সৃষ্টি করে নবী (সাঃ) উচ্চৈঃস্বরে বললেন ঃ তোমরা সবাই একাগ্রচিত্তে শুনে মানসপটে অঙ্কিত করে জেনে রেখো—তোমাদের রক্ত, তোমাদের জান, তোমাদের মান, তোমাদের ইজ্জত, তোমাদের গাত্রচর্ম যেভাবে আজকের এই মহান ইয়াওমুন্নহর-এর দিনে এ পবিত্র জিলহজ্জ্ মাসে, এই পবিত্র হেরেম শরীফে হারাম—সুরক্ষিত ও অস্পর্শিত, ঠিক এমনিভাবে সর্বদিনে সর্বমাসে ও সর্বস্থানে হারাম এবং সুরক্ষিত গণ্য হবে। অচিরেই তোমরা আল্লাহর দরবারে হাজির হবে; আল্লাহ তোমাদের সমুদয় কাজকর্মের হিসাব নেবেন।

ভাষণ-শেষে নবী (সাঃ) শ্রোতৃবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এই মহান মূল নীতিটি তোমাদের পৌছে দিলাম তো? একবাক্যে সকলেই স্বীকার করল—হাঁ, হাঁ। তখন তিনি বললেন ঃ হে খোদা! এই স্বীকারোক্তির ওপর সাক্ষী থেকো। তারপর নবী (সাঃ) আরো বললেন ঃ এই মহান মুলনীতি যারা আমার কাছে উপস্থিত থেকে শুনেছে তারা অনুপস্থিত ব্যক্তিদের একে অন্যকে, তারপর পরস্পর, কেয়ামত পর্যন্ত শুনিয়ে জানিয়ে শিক্ষা দিতে বাধ্য থাকবে। কারণ অনেক ক্ষেত্রে এমন হবে যে আমার বাণী মূল শ্রোতা অপেক্ষা তার (অর্থাৎ শ্রোতার) শিষ্যরা অধিক সংরক্ষণ ও কার্যকরী করতে এবং অধিক স্মরণ রাখতে সমর্থ হবে। [প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে আগ্রহ সৃষ্টি

করে শিক্ষা বা জ্ঞান দান করা, শিক্ষাকে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে গণশিক্ষায় রূপান্তরিত করা এবং শিক্ষাদানকর্মকে প্রত্যেক শিক্ষিত বা জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে বাধ্যতামূলক করা এই হাদীসের লক্ষ্য ।]—বুখারী ।

* রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের (মনের অবস্থার) দিকে লক্ষ্য রেখে কতকগুলো নির্দিষ্ট দিনে উপদেশ দিতেন; পাছে আমাদের বিরক্তি ধরে এই আশঙ্কায়। [সুদূর অতীতের এই শিক্ষাদান-কর্মে আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের মূল নীতির প্রকাশ কি সবিস্ময়ে লক্ষ্যণীয় নয়?]-বুখারী। বর্ণনায় ঃ ইবনে মাসউদ (রাঃ)।

* (শিক্ষা বা জ্ঞান দানের জন্য) সহজ পথ ধর, কড়াকড়ি করো না; সুসংবাদ দাও (খোদার রহমতের)-(ভয় দেখিয়ে) তাড়িয়ে দিও না।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

* রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ কেয়ামতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে কয়েকটা এই-জ্ঞান হ্রাস পাবে, অজ্ঞতা জমাট হবে, মদ পান করা হবে, ব্যভিচার ব্যাপক হবে এবং স্ত্রীলোক বৃদ্ধি পাবে পুরুষ কমবে, এমনকি পঞ্চাশজন স্ত্রীলোকের কর্তা হবে একজন পুরুষ।-বুখারী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

* রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ বান্দার মন থেকে জ্ঞান বের করে নিয়ে খোদা জ্ঞান তুলে নেবেন না; বরং আলেম অর্থাৎ জ্ঞানীদের মৃত্যুর মাধ্যমে তা তুলে নেবেন। অবশেষে যখন কোন জ্ঞানী আর থাকবে না, তখন লোকে মূর্খদের নেতা বলে বরণ করে নেবে। তাদের কাছে ধর্মের বিধান জিজ্ঞাসা করবে, আর তারা না জেনেই (সে) বিধান দেবে। তারা নিজেরা হারাবে এবং অন্যদের পথহারা করবে। —বুখারী। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ)।

* রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ মুসা নবী বনি ইসরাঈলদের মধ্যে ভাষণ দেবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন্ ব্যক্তি সবচেয়ে জ্ঞানী? তিনি বললেন, আমিই সবচেয়ে জ্ঞানী? তাঁর জ্ঞানকে খোদার ওপর ন্যস্ত না (করে অহঙ্কার) করার দরুন খোদা তাঁকে তিরস্কার করলেন। তারপর খোদা তাঁকে আকাশবাণী (অহী) মারফৎ জানালেন, 'দুই সাগরের সঙ্গমস্থলে আমার এক বান্দা আছে, সে তোমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী।' মুসা

বললেন ঃ 'প্রভু আমার, আমি কিভাবে তাঁর সাথে মিলিত হব? তাঁকে বলা হল, 'তোমার থলিতে একটা মাছ রাখ। যেখানে তুমি ঐ মাছ হারাবে সেখানেই সে (আছে)। তখন তিনি থলিতে একটি মাছ এবং অনুচর য়ুশফ ইবনে নূনকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হলেন। অবশেষে তাঁরা এক খণ্ড বড় পাথরের চাতানের কাছে এসে হাজির হলেন এবং সটান শুয়ে ঘুমুলেন। মাছটা থলি থেকে বেরিয়ে সমুদ্রে সুড়ঙ্গ করে সোজা পথ ধরল। মুসা ও তাঁর অনুচরের কাছে এ ছিল এক আশ্চর্য ব্যাপার! তারপর তাঁরা দিনের বাকি অংশ এবং সারা রাত (আবার) চললেন। পরদিন ভোরে মুসা তাঁর অনুচরকে বললেন, ভ্রমণে আমরা বড় ক্লান্ত হয়েছি; নাশ্‌তা (খাবার) আন তো!' (অবশ্য) যে স্থানের কথা মুসাকে বলা হয়েছিল সেই স্থান অতিক্রম করার পূর্বে মুসা কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ করেন নি। তাঁর অনুচর বলল ঃ 'দেখুন যখন আমরা পাথরের চাতানে আশ্রয় নিয়েছিলাম, আমি মাছের (হারিয়ে যাবার) কথা বলতে ভুলে গিয়েছি।' মুসা বললেন, 'ঐ স্থানই তো আমরা চাইছিলাম।' তারপর উভয়ে (তাঁদের) নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে এলেন। যখন তাঁরা ঐ পাথরের চাতানে পৌছলেন, দেখলেন একজন লোক (খজির) কাপড় মুড়ি দিয়ে আছেন। মুসা সালাম করলেন। খজির বললেন, 'এ দেশে সালাম কোথা?' (অর্থাৎ এখানে সালামের রীতি নেই; তুমি কে?) মুসা বললেন, 'আমি মুসা।' খজির বললেন, 'বনি ইসরাঈলের মুসা? মুসা বললেন, 'হাঁ।' তিনি (মুসা) আরো বললেন, 'আল্লাহ আপনাকে যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন তার কিছু আপনি আমাকে শেখাবেন—এই উদ্দেশ্যে কি আমি আপনার অনুসরণ করব?' তিনি (খজির) বললেন, 'তুমি কখনই আমার সাথে ধৈর্য রাখতে পারবে না। হে মুসা, খোদা আমাকে এমন জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জান না; আর খোদা তোমাকে এমন জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন যা আমি জানি না।' মুসা বললেন, 'আল্লাহর ইচ্ছা হলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল দেখতে পাবেন এবং কোন ব্যাপারে আমি আপনার অবাধ্যতা করব না।' তখন তাঁরা দুজনে সমুদ্রের ধার দিয়ে চললেন। তাঁদের কোন নৌকা ছিল না।' এই সময় তাঁদের কাছ দিয়ে একখানা নৌকা যাচ্ছিল। তাঁরা নৌকার লোকদের তাঁদের তুলে নিতে বললেন। খজির পরিচিত থাকায় তারা বিনা ভাড়ায় তাদের তুলে নিলেন। তারপর এক চড়ুই এসে নৌকার কিনারায় বসল এবং একবার কি দুবার সমুদ্রে

ঠোঁট ডুবাল। তখন খজির বললেন, ' হে মুসা, তোমার ও আমার জ্ঞান খোদার জ্ঞানের কাছে সমুদ্রের সামনে ঐ চড়ুই-এর ঠোঁটের পানির চেয়েও সামান্য। (এরপর) খজির নৌকার একখানা তক্তার দিকে গেলেন এবং তা খুলে ফেললেন। মুসা বললেন, 'এরা বিনা ভাড়ায় আমাদের তুলে নিল আর আপনি গিয়ে এদের নৌকায় ছিদ্র করে দিলেন, ফলে এদের লোকজনদের ডুবিয়ে দেবেন।' তিনি বললেন, 'আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবে না?' মুসা বললেন, 'আমার ভুলের জন্য দোষ ধরবেন না এবং আমার প্রতি এই ব্যাপারে (প্রতিবাদে) বেশী কঠোর হবেন না।' এই প্রথম ব্যাপারটা মুসার ভুল বলে গণ্য হল। তাঁরা আবার চললেন। দেখলেন, এক বালক আর এক বালকের সাথে খেলা করছে। খজির হাত দিয়ে তার মাথার ওপরের দিক ধরলেন এবং তা (তার দেহ থেকে) বিচ্ছিন্ন করে দিলেন।মুসা বললেন, 'হত্যার বিনিময় ব্যতীতই আপনি একটা নির্দোষ জীবকে হত্যা করলেন।' তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি আমার সাথে ধৈর্য রাখতে পারবে না?' তাঁরা আবার চলতে লাগলেন এবং অবশেষে এক গ্রামে এসে পৌঁছলেন। গ্রামবাসীদের কাছে তাঁরা খাদ্য চাইলেন, কিন্তু তারা তাঁদের আতিথ্য করতে অস্বীকার করল। সেখানে তাঁরা একটা দেওয়াল পড়ে যেতে দেখলেন। খজির হাত দিয়ে ইশারা করে সোজা খাড়া করে দিলেন। মুসা বললেন, 'আপনি ইচ্ছা করলে তো এর জন্যে মজুরী নিতে পারতেন।' তিনি (খজির) বললেন,'এই আমার ও তোমার মধ্যে বিচ্ছেদ।' রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন; খোদা মুসার মঙ্গল করুন; যদি তিনি ধৈর্য ধরতেন তাহলে কি ভালই না হত; আর খোদা আমাদের কাছে বর্ণনা করতেন এই দুজনের আরো ঘটনা। [যথার্থ জ্ঞানার্জনের জন্য ধৈর্য, অহঙ্কারশূন্যতা এবং শিক্ষক বা ওস্তাদকে শ্রদ্ধাসহকারে যথাযথভাবে অনুসরণ অবশ্য প্রয়োজন।]—বুখারী।

* মূর্খতা অপেক্ষা বড় দারিদ্র আর নেই।—সগির।

* আক্ষেপ তার জন্য যে জানে না এবং তার জন্য যে জানে অথচ করে না।-সগির।

* যে জ্ঞানী মানুষকে সদুপদেশ দেয় অথচ নিজে তা পালন করে না সে সেই প্রদীপের তুল্য যা মানুষকে আলো দান করে কিন্তু আপন আত্মাকে দগ্ধীভূত করে।-সগির।

* 'উত্তম জ্ঞানী কারা?' তিনি (রসূলুল্লাহ্ সঃ) বললেন, যারা পালন করে যা তারা জানে।'—মিশকাত।

* রোজ কিয়ামতে সেই ব্যক্তি জ্ঞানীর শ্রেণীতে সর্বাপেক্ষা অধম যে তার জ্ঞান দ্বারা কোন উপকার লাভ করে নি। —মিশকাত।

* রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এক ব্যক্তি অসৎ লোকদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন ঃ আমাকে অসৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর না বরং সৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর। তিনবার একথা বলার পর তিনি বললেন ঃ জেনো, শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা অসৎ, মানুষের মধ্যে তারাই সর্বাপেক্ষা অধম এবং শিক্ষিতদের মধ্যে যারা সৎ তারাই সর্বাপেক্ষা উত্তম।—মিশকাত।

* যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পরিবর্তে পার্থিব ভোগ বিলাস লাভের উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন করে, পরকালে কখনো সে বেহেশ্তের সৌরভ লাভ করবে না।—আঃ দাউদ। ই. মাজা। মিশ্। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

* সন্তানকে আদবকায়দা শিক্ষা দেওয়া ভিক্ষুককে একবস্তা আটা দান করা অপেক্ষা অধিক পুণ্যজনক।—তিরমিজী।

* যে জ্ঞান দ্বারা কোন উপকার হয়নি তা সেই রত্নাগারের তুল্য যা থেকে খোদার পথে কিছুই ব্যয়িত হয়নি।—মিশকাত।

* রাত্রিকালে এক ঘন্টা জ্ঞানানুশীলন করা সমস্ত রাত্রি জেগে উপাসনা করা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর।—মিশকাত।

* খোদার সৃষ্টি সম্বন্ধে নিবিষ্ট মনে এক ঘন্টা চিন্তা করা সত্তর বৎসরের উপাসনা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর।

* জিব্রাঈলের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম; মানুষের নেতা কি? তিনি বললেন—বুদ্ধি।—সগির।

* মানুষের পরিচয় তার বুদ্ধির পরিমাপ হিসেবে; যার বুদ্ধি নেই, তার ধর্ম নেই।—বায়হাকী।

* জ্ঞান অর্জন কর, কারণ যে ব্যক্তি খোদার পথে জ্ঞান অর্জন করে সে পুণ্য কাজ করে; যে সে বিষয়ে আলোচনা করে সে আল্লাহর প্রশংসা করে এবং যে তা অন্বেষণ করে সে আল্লাহর উপাসনা করে এবং যে তা শিক্ষা

দেয় সে দান করে, এবং যে তার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করে সে আল্লাহর উপাসনা করে, জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ কল্যাণ ও মহত্ত্বের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে এবং ইহলোকে নৃপতিদের সাহচর্য ও পরলোকে পরিপূর্ণ সুখ লাভ করে; জ্ঞান অর্জন কর, এ তার অধিকারীকে অন্যায় থেকে ন্যায়কে পৃথক করতে সমর্থ করে; এ বেহেশ্‌তের পথ আলোকিত করে। মরুভূমিতে এ বন্ধু সদৃশ, নির্জনে এ আমাদের সঙ্গী, বন্ধুহীন অবস্থায় এ আমাদের সহচর; এ আমাদের সুখের দিকে পরিচালিত করে এবং দুঃখে আমাদের জীবিত রাখে, বন্ধুদের মধ্যে এ আমাদের অলঙ্কার স্বরূপ এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে বর্ম।—জামেয়ে আখবার।

* বৃদ্ধ ব্যক্তি রুটি খেতে যেমন লজ্জাবোধ করে না, জ্ঞান অর্জন করতেও তেমনি লজ্জা বোধ করবে না।—সগির।

* যে ব্যক্তি ৪০ দিনের মধ্যে কোন শিক্ষিত সমাজে বসে না নিশ্চয়ই তার হৃদয় কঠিন হয়েছে এবং সে মৃত হয়েছে। কারণ জ্ঞান হৃদয়ের জীবন ও জ্যোতি। মাটির তলায় লোহা থাকলে তাতে যেমন মরিচা ধরে, জ্ঞানহীন ব্যক্তির হৃদয়েও তেমন মরিচা ধরে। জিজ্ঞাসা করা হল ঃ কি করলে হৃদয়ের মরিচা দূর হয়? তিনি (রসূলুল্লাহ সাঃ) বললেন ঃ জ্ঞানীদের সমাজে উপবেশন।—ওসিয়াতুন্নবী।

* যে ব্যক্তি বিদ্যাকে জীবন দান করে তার কখনো মৃত্যু হয়না।—বর্ণনায় ঃ হযরত আলী (রাঃ)।

* জ্ঞানকে সৃদুঢ় কর, তার অনুসরণ কর এবং তার অবাধ্য হয়ো না—নতুবা পরিণামে অনুতপ্ত হবে।—সগির।

* অনেক উপাসক মূর্খ এবং অনেক জ্ঞানী কুকর্মশীল হয়, অতএব মূর্খ উপাসক এবং অসৎ জ্ঞানীকে পরিত্যাগ কর।— সগির।

* মনে রেখো, আমার অনুবর্তীদের মধ্যে যাঁরা জ্ঞানী তাঁরাই উৎকৃষ্ট এবং জ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা দয়ালু তাঁরাই সর্বোৎকৃষ্ট। আল্লাহ তা'লা মূর্খের একটা পাপ মাফ করার পূর্বে জ্ঞানীর ৪০টা পাপ মাফ করেন।—সগির।

* জ্ঞানীদের অনুসরণ কর, কারণ তাঁরা ইহকালের প্রদীপ এবং পরকালের বাতি।—সগির।

* আল্লাহর উদ্দেশ্যে জ্ঞান আহরণ করা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা অপেক্ষা অধিক পুণ্যজনক। —সগির।

* জ্ঞানের একটা বাক্য জ্ঞানীর হারানো পশুর সমান; যেখানেই পাওয়া যায় সেখানেই তা তার গ্রহণ করার অধিকার আছে।—তির। ই.মাজা।

* রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন প্রথম যে ব্যক্তির বিচার হবে সে একজন শহীদ। তাকে হাজির করা হবে এবং আল্লাহ তাকে আপন নেআ'মত (দান) স্মরণ করিয়ে দেবেন, আর সেও তা স্মরণ করবে। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করবেন ঃ তুমি এ দানের বিনিময়ে (দুনিয়ায়) কি কাজ করেছ? সে উত্তর করবে ঃ আপনার (সন্তুষ্টির) জন্য আমি যুদ্ধ করেছি, এমন কি আমি শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ বলবেন ঃ তুমি মিথ্যা বলছ; তুমি আমার সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করনি; বরং যুদ্ধ করেছ যাতে তোমাকে 'বীর পুরুষ' বলা হয় সে জন্য-আর তা বলা হয়েছে। তারপর তার সম্বন্ধে আদেশ দেওয়া হবে। সুতরাং তাকে উপুড় করে টানতে টানতে নরকে নিক্ষেপ করা হবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি, যে জ্ঞান বা বিদ্যাশিক্ষা করেছে ও অপরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কোরআন পড়েছে (ও অপরকে শিক্ষা দিয়েছে)—তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ প্রথমে তাকে আপন দানের (কথা) স্মরণ করিয়ে দেবেন এবং সে তা স্মরণ করবে। তখন আল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করবেন ঃ তুমি এ সকল দানের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কি করেছ? সে উত্তর দেবে ঃ আমি জ্ঞান শিক্ষা করেছি ও তা শিক্ষা দিয়েছি এবং আপনাকে খুশী করার জন্য কুরআন পড়েছি। তখন আল্লাহ বলবেন ঃ তুমি মিথ্যা বলছ ঃ তুমি জ্ঞান শিক্ষা করেছ যাতে তোমাকে জ্ঞানী (আলো) বলা হয়(সেজন্যে), আর কুরআন পড়েছ যাতে তোমাকে ক্বারী (বিশুদ্ধ পাঠকারী) বলা হয় সেজন্যে; আর তা তোমায় বলাও হয়েছে। তারপর (ফেরেশতাদের) আদেশ দেওয়া হবে, সুতরাং তাকে উপুড়ে করে টানতে টানতে নরকে নিক্ষেপ করা হবে।

তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি আল্লাহ যার রেজেক প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন এবং সমস্ত রকমের ধন তাকে দান করেছিলেন। তাকে আল্লার দরবারে হাজির করা হবে; আল্লাহ তাকে আপন দানের কথা স্মরণ করিয়ে

দেবেন, সেও তা স্মরণ করবে। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করবেন ঃ তুমি এ সবের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কি করেছে? উত্তরে সে বলবে ঃ এমন কোন পথ বাকি ছিল না যে পথে দান করলে আপনি খুশী হবেন আর আপনার খুশীর জন্যে আমি (সেপথে) দান করিনি। তখন আল্লাহ বলবেন ঃ তুমি মিথ্যা বলছ; তুমি দান করেছিলে যাতে তোমাকে দাতা বলা হয় সেই উদ্দেশ্যে, আর (তোমাকে) তা বলাও হয়েছে। তারপর (ফেরেশ্‌তাদের) আদেশ করা হবে; সুতরাং তাকে উপুড় করে টানতে টানতে নরকে নিক্ষেপ করা হবে। [উদ্দেশ্য খারাপ হলে ভাল কাজেরও খারাপ ফল হয়]-মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

* যে ব্যক্তি জ্ঞানীদের সাথে তর্ক, মূর্খদের সাথে বাক্‌বিতণ্ডা এবং মানুষকে নিজের দিকে আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে জ্ঞান শিক্ষা করেছে-আল্লাহ তাকে নরকে নিক্ষেপ করবেন।- তিরমিজী। মিশকাত। বর্ণনায় ঃ কা'ববিন মালেক (রাঃ)।

* (আমার মৃত্যুর পর) মানুষ তোমাদের অনুসরণকারী হবে। পৃথিবীর যখন তারা তোমাদে কাছে ধর্মজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে আগমন করবে। যখন তারা তোমাদের কাছে আসবে—সদুপদেশ (অর্থাৎ সৎ শিক্ষা) দিও।—তির। মিশ। বর্ণনায়ঃ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)।

* হযরত কাসির বিন কায়েস (তাবেঈ) বলেন ঃ (একদিন) আমি দামেস্কের মসজিদে হযরত আবুদ্দরদা সাহাবীর সাথে বসে আছি, এমন সময় তাঁর কাছে একজন লোক এসে পৌছুলো এবং বলল ঃ হে আবুদ্দারদা! আমি সুদুর মদীনাতুন্নবী থেকে আপনার কাছে শুধু একটা হাদীসের জন্য ছুটে এসেছি, এছাড়া অন্য কোন প্রয়োজন নয়। তখন হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বলতে শুনেছি) "যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষণের উদ্দেশ্যে কোন পথে চলতে শুরু করে সেই পথের সাহায্যে আল্লাহ তাকে বেহেশ্‌তের বহু সংখ্যক পথের মধ্যে একটা পথে পৌছে দেন আর ফেরেশ্‌তারা জ্ঞানান্বেষণকারীদের সন্তুষ্টির জন্য (সেইপথে) নিজেদের ডানা পেতে দেন।" [এরপর ৪৯০ সংখ্যক হাদীস দেখুন।]—আহমদ। তির। আ. দাউদ। ই. মাজা। দারেমী।

* যে ব্যক্তি ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত সে আশীর্বাদপ্রাপ্ত, কারণ লোকে যদি

তার কাছে যাওয়া আবশ্যাক মনে করে তবে সে ওর প্রশ্নের সমাধান করে এবং যদি তার কাছে প্রয়োজন না থাকে তবে সে নিজের আত্মার উন্নতি সাধন করে।-মিশকাত।

* যে ব্যক্তি বিদ্যা ও বিদ্বানদের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করে সে আল্লাহ কর্তৃক অনুগৃহীত হয়।

* যদি মানুষ হযরত নূহের মত চার হাজার বছরও উপাসনা করে তবু তা তার কোন কাজে আসবে না, যদি তার মধ্যে তিনটে গুণ না থাকে-জ্ঞানান্বেষণ, মিতব্যয়িতা এবং পাপ থেকে সংযম।-ওসিয়াতুন্নবী।

* রোগীর সেবার জন্য এক মাইল যাও, দুই ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ-মীমাংসার জন্য দু'মাইল যাও, তোমার মুসলমান ভায়ের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তিন মাইল যাও এবং জ্ঞানের একটা কথা শিক্ষার জন্য ছমাইল যাও। (এখানে মাইল বিষয়ের গুরুত্ব জ্ঞাপক)। —ওসিয়াতুন্নবী।

তিন.

পবিত্র কুরআন সেই মহাগ্রন্থ যাতে যুগযুগান্তের মানুষের জন্য দিক নির্দেশনা প্রদত্ত হয়েছে। পবিত্র কুরআনকে যদি আমরা বলি মহাপ্রলয় কালাবিধি মানব জাতির সামনে তা আলোকস্তম্ভ রূপে বিরাজ করবে তাহলে তা মোটেও অত্যুক্তি হবে না। জীবন ও জগতের, ইহকাল ও পরকালের যে মহাসনদ তাতে প্রদত্ত হয়েছে, তার লয় নেই, ক্ষয় নেই— তা অজর, অমর, অব্যয়, অক্ষয়। তার প্রকৃত অনুসারীরা জগতে কোনো কালেও বিভ্রান্ত হবে না।

পবিত্র কুরআনে অসংখ্য অগণিত বিষয় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে অত্যন্ত মহিমান্বিত ভাষায় লিখিত হয়েছে। যা যুগ যুগ ধরে আলোচনা গবেষণা ও অধ্যয়ন করলেও শেষ হবে না। পবিত্র কুরআনে যথার্থই বলা হয়েছে যে, কুরআন বিজ্ঞানময় গ্রন্থ, আল্লাহ বিজ্ঞানময়। তাই পবিত্র কুরআনে বিজ্ঞানসম্পর্কিত বাণী ও বিষয়গুলি যুগ-যুগান্তের বিজ্ঞান সাধক ও অনুসন্ধানীদের চিরকালের কৌতুহলের বিষয়। উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনের বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়াবলী যেমন অতীতের বিজ্ঞানীদের —তেমনি বর্তমানের বিজ্ঞানীদের অধ্যয়ন ও গবেষণার বিষয়রূপে অতীব মর্যাদা লাভ করেছে। এসকল বিজ্ঞানীদের অন্যতম হলেন ফরাসী বিজ্ঞানী ডক্টর মরিস

বুকাইলি। এই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে খুবই আলোচিত ও সমাদৃত ব্যক্তিত্ব। তার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ Bible Quran & Science. সমগ্র বিশ্বের সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁর 'মানুষের আদি উৎস' গ্রন্থটিও সমভাবে সমাদৃত বিশ্বের সুধী সমাজে। তাঁর এই ধারার অন্যতম গ্রন্থ হল, 'Quran and Modern Science', 'কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান' নামক এ গ্রন্থখানিও বিশ্বে সমভাবে সমাদৃত। গ্রন্থটি ক্ষীণকায় হলেও তা বৈজ্ঞানিক সুলভ প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ। বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী ডক্টর মরিস বুকাইলি মূল বইটি ফরাসী ভাষায় প্রকাশ করেন— সাথে সাথে তা ইংরেজী, আরবি, ফারসি, উর্দূ, হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়ে ব্যাপক প্রচার লাভ করে। এর কোনো বাংলা অনুবাদ আজ পর্যন্ত আমার নজরে পড়েনি। ফলে, আমি তা বাংলা অনুবাদ করতে উৎসাহী হয়ে উঠি-এবং এই পুস্তিকাখানি খুব কম সময়ের মধ্যে বাংলায় অনুবাদ করি।

এখন অতি সংক্ষেপে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

লেখক ডক্টর মরিস বুকাইলি তাঁর গ্রন্থের প্রারম্ভে কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করেছেন। তিনি অত্যন্ত আনন্দের সাথে এখানে উল্লেখ করেছেন, আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে অবতীর্ণ পবিত্র কুরআনের বিজ্ঞান বিষয়ক সিদ্ধান্তগুলির সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি কি আশ্চর্যভাবে মিলে যায়। বিজ্ঞান-শাস্ত্রী লেখক ডক্টর বুকাইলির আলোচ্য বিষয় যেহেতু 'আধুনিক বিজ্ঞান ও কুরআন' সেহেতু আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের মৌলিক সিদ্ধান্তগুলির চুলচেরা বিশ্লেষণ তিনি পবিত্র কুরআনের আলোকে করেছেন। উল্লেখ্য বিজ্ঞানশাস্ত্রী লেখক ডক্টর বুকাইলি এ গ্রন্থ রচনার পূর্বে কোন পুরাতন বিশ্বাস ও ধারণা নিয়ে যে এ কাজে অগ্রসর হননি —সে কথা তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি— "শুরুতে ইসলামের প্রতি আস্থা নয়; বরং সত্যের সরল অনুসন্ধানই আমার পথ প্রদর্শন করে। আজো আমি এই পথটিই অনুসরণ করে থাকি। তারপর এ অধ্যয়ন ও গবেষণা শেষে আমার পূর্ণ বিশ্বাস জন্মেছে যে, কুরআন বাস্তবিকই এক পয়গাম্বরের উপরে অবতীর্ণ এক মহান গ্রন্থ।" এই সত্যের আলোকে তিনি

অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন—"মুহম্মদ (সাঃ)-এর যুগের কোনো ব্যক্তির পক্ষেই সে যুগে উপলব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে এ সত্য লিপিবদ্ধ করা সম্ভব ছিল না।"

তারপর লেখক ডক্টর মরিস বুকাইলি পবিত্র কুরআনের বিজ্ঞান-বিষয়ক আয়াতগুলিকে নিয়ে বর্তমান যুগের বিজ্ঞানের আলোকে চুলচেরা বিশ্লেষণ ও গবেষণা চালান। এ কাজ করার শুরুতেই তিনি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে বিস্তৃত পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলিকে পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে সেগুলিকে ধারানুক্রমিকভাবে অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানে ব্রতী হন। এই পারস্পরিক অধ্যয়নের বিষয়গুলি পর্যাক্রমে সৃষ্টি, তত্ত্ব জ্যোতির্বিজ্ঞান, পৃথিবী, মানবসৃজন, কুরআন ও বাইবেল, অহী, জীবন, মানবজাতি, আল্লাহ প্রদত্ত পথ, সত্যের মানদণ্ড ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধ্যায়ে সাজিয়েছেন। লেখক এখানে স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন— "কুরআন বোঝার জন্য বহুমুখী এবং বিস্তৃত অধীত জ্ঞানের প্রয়োজন।" তারপর লেখক এ বিষয়ে অতিসংক্ষেপে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এ বিষয়টি বোঝানোর জন্য তিনি পবিত্র কুরআন হতে প্রাসঙ্গিক আয়াতগুলির উদ্ধৃতি পেশ করেছেন।

এই অধ্যায়ে 'বিশ্বসৃষ্টি' বিষয়ে তিনি পবিত্র কুরআনের আলোকে আলোচনা সম্পন্ন করেছেন। এ বিষয়ে আলোচনা শেষে তিনি এই বলে উপসংহার টেনেছেন যে— "এই পর্যবেক্ষণ থেকে স্পষ্টভাবেই জানা যায় যে, বিজ্ঞানের আধুনিক পরিসংখ্যান ও পবিত্র কুরআনের বর্ণনার মধ্যে সত্যের এক গভীর ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। লেখক এভাবে তার সূক্ষ্ম ও গভীর পর্যবেক্ষণ শেষে পাশ্চাত্যের খ্রিস্টবাদী লেখক-বিজ্ঞানী বুদ্ধিজীবীদের ইসলাম বিষয়ে প্রোপাগান্ডার অত্যন্ত পরিপক্ক ও মার্জিত জবাব দিয়ে তাদের প্রচারিত সমস্ত ধ্যান-ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন।

এরপর এসেছে খগোল-শাস্ত্র বা জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়। আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম অগ্রণী এক বিজ্ঞান জ্যোতির্বিজ্ঞান নামে সুপরিচিত। বহুকাল ধরে এ বিজ্ঞান চর্চিত হয়ে আসছে— বর্তমানে তা মানবসভ্যতার এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। বিজ্ঞানী লেখক ডক্টর বুকাইলি এ অধ্যায়ে পবিত্র কুরআনের জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক সিদ্ধান্তগুলি আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোকে অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করেছেন।

জোতির্বিজ্ঞান ও গতি পরস্পর সম্পর্কিত বিষয়। উভয়ের অস্তিত্ব উভয়ের সাথে জড়িত। তিনি এ অধ্যায়ের প্রথম দিকে গতিবিদ্যা সম্পর্কিত এই আয়াতটি উদ্ধৃত করেছেন ঃ "এবং তিনিই রাত ও দিন -সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ গতিপথে সন্তরণরত।" আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে পবিত্র কুরআনে উক্ত এ বাণীর কোনো তুলনা আছে? আজকের আধুনিক বিজ্ঞান তো উক্ত মতের সাথে সন্দেহাতীতভাবে একমত।

বর্তমান যুগে তো একথা সর্বজনবিদিত সত্য যে, মহাশূন্যে, মহালোকে ভিন্ন ভিন্ন আকাশ ও গ্রহ নক্ষত্রের অস্তিত্ব রয়েছে। মানুষ যে অন্তরীক্ষ বিজয়ে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে, আর নব নব সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত— তার উল্লেখও পবিত্র কুরআন থেকে উপলব্ধ। মানুষ তার যুগ যুগান্তরের অভিজ্ঞতা আর অর্জিত জ্ঞানকে অবলম্বন করে চন্দ্রপৃষ্ঠে পা রাখতে সমর্থ হয়েছে। মহানবীর (সাঃ) মীরাজ বা মহাকাশ ভ্রমণ কি আল্লাহর অসীম কুদরতের দান নয়? পবিত্র কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে ডক্টর বুকাইলি এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন: 'হে জ্বিন ও মনুষ্যমণ্ডলি! যদি তোমাদের সামর্থ্য থাকে, তাহলে আকাশ ও পৃথিবীর সীমা থেকে বেরিয়ে যেতে চাইলে যাও। তোমরা আমাদের (শক্তি) ব্যতীত তা পারবে না।" এ প্রসঙ্গে লেখকের অভিব্যক্ত ঃ "এ শক্তি সর্ব শক্তিমান আল্লাহর কাছ থেকেই পাওয়া যায়।" এ সূরাটির (সূরা-রহমান) পুরো বিষয়টিই হল মানুষকে আল্লাহর করুণার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা— যাতে তারা তাঁকে চিনতে ও স্বীকার করতে পারে।

এরপরে এসেছে, 'পৃথিবী' প্রসঙ্গ। এখানে অতি সংক্ষেপে মাটির পৃথিবী ও ভূ-বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ এসেছে। লেখক এখানে সূরা আজ-জুমার এর ২১ আয়াত উদ্ধৃত করে আল্লাহর অসীম করুণা, রহমত ও তাঁর সৃষ্টি কৌশলের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন ঃ "তোমরা কি দেখোনি যে, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তারপর তা পৃথিবীপৃষ্ঠে বইয়ে দেন? তারপর তা থেকে নানা বর্ণের ফসল উৎপন্ন হয়।"

এর চেয়ে সত্য, আর এর চেয়ে সুন্দর কথা কবে কোথায় কোন্ কালে

মানুষ শুনেছে'? অথচ আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে পবিত্র কুরআনেই তা ব্যক্ত হয়েছে এবং আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান তা শ্রদ্ধাবনতমস্তকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।

পৃথিবীতে মৃত্তিকা বিজ্ঞানের সাথেই সম্পর্কিত ভূগর্ভ-বিজ্ঞান। পবিত্র কুরআনে সূরা আন নাবার উদ্ধৃতি পেশ করেছেন লেখক। ঐ সূরার ৬-৭ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

"আমরা কি পৃথিবীকে বিছানা (বিস্তৃত) এবং পর্বতগুলিকে দৃঢ়রূপে স্থাপন করিনি'?"

সূরা ত্বাহা-র ৫৩ সংখ্যক আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখক উদ্ভিদবিদ্যা সম্পর্কে কুরআনের সিদ্ধান্তকে আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে মেলানোর প্রয়াস পেয়েছেন ঃ "তিনিই তোমাদের জন্য ধরণীকে বিছানা বানিয়েছেন এবং তোমাদের (চলাচলের) জন্য রাস্তা বের করে দিয়েছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, তার দ্বারা আমরা জোড়ায় জোড়ায় উদ্ভিদ (তথা বৃক্ষ) সৃষ্টি করেছি, (যারা) একে অন্য থেকে পৃথক।"

এইভাবে বিজ্ঞানী লেখক ডক্টর বুকাইলি আরো অগ্রসর হয়ে মানবসৃষ্টি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বাণী বিশ্লেষণ করেছেন আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে। এ ক্ষুদ্র অধ্যায়ের শুরুতেই লেখক বলেছেন ঃ "মানব প্রজনন বিষয়ে পবিত্র কুরআনের বক্তব্য ভ্রূণ বিজ্ঞান বিষয়ে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ অবদান।" তারপর লেখক এখানে জনৈক আরব যুবকের একটি স্মরণীয় উদ্ধৃতি পেশ করেছেন, যা মূল গ্রন্থেই উদ্ধৃত হয়েছে এবং এ বিষয়টির গুরুত্ব অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। মানবসৃষ্টি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সিদ্ধান্ত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গভীরতর অধ্যয়ন ও গবেষণার বিষয়। বিজ্ঞানশাস্ত্রী লেখক ডক্টর বুকাইলি অত্যন্ত গভীর সমালোচনা ও গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, মানবসৃষ্টি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞান পবিত্র কুরআনের কাছে চিরঋণী।

এর পরের অধ্যায়ে লেখক কুরআন ও বাইবেলের মধ্যে তুলনামূলক অধ্যয়ন ও গবেষণার ফলাফল লিপিবদ্ধ করেছেন। লেখক এ অধ্যায়ে খ্রিষ্টপন্থী বাইবেলবাদী পাশ্চাত্য লেখকদের নানাবিধ মিথ্যা ও অবৈজ্ঞানিক দাবীকে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছেন। পবিত্র

কুরআনের কাছে সেই বাইবেলীয় ধ্যানধারণা যে কতটা পশ্চাৎপদ এবং অনাধুনিক— লেখক এখানে ক্ষুদ্র একটি উদাহরণের সাহায্যে পেশ করার প্রয়াস পেয়েছেন ঃ "বাইবেলে বর্ণিত বংশলতিকাকে অবলম্বন করে ইহুদী ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করা হয়েছে, যাতে দাবি করা হয়েছে পৃথিবীর বয়স ৫৭৩৮ বছর। এ বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। সৌরমণ্ডলের বয়স সম্ভবত সাড়ে চার হাজার কোটি বছর। এবং পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব সম্পর্কে আমরা যা জানি, তা কমপক্ষে দশ হাজার বছরেরও অধিক।"

লেখক এ অধ্যায়ে বাইবেল এবং কুরআনের মধ্যে বর্ণিত বহু বিষয়ের তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেলের বহু ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন।

এর পরবর্তী অধ্যায় হল 'অহী' যা পবিত্র ইসলামের নবূয়ত ও রিসালতের ধারার এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। লেখক এখানে অহী-র আলোকে মানবজাতি, আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান, অহীর প্রকাশ, ও অহীর শেষ প্রকাশ বিষয়ে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন।

এই অধ্যায়ের শেষ পর্যায়ে লেখক 'সত্যের মানদণ্ড' নামে এক ক্ষুদ্র উপশিরোনামে সত্যের মানদণ্ড নিরূপণে ৬টি পদ্ধতি অনুসরণের কথা বলেছেন। লেখক এর শুরুতেই লিখেছেন ঃ "একথা আমরা কিভাবে বুঝব যে, অহী এবং উদাহরণত পবিত্র কুরআন সন্দেহাতীত রূপে আল্লাহর বাণী! সত্যের মানদণ্ড থেকেই যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই তা সহজে অনুধাবন করা সম্ভব।" এই ৬টি পদ্ধতি কি, এই গ্রন্থ পাঠে পাঠক তা স্পষ্টরূপে জানতে এবং বুঝতে সক্ষম হবেন।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী ও লেখক ডক্টর মরিস বুকাইলি বিশ্বের সুধীসমাজে একটি সুপরিচিত নাম। ফ্রান্সের অধিবাসী ডক্টর মরিস বুকাইলি তাঁর বৈজ্ঞানিক জীবনে অত্যন্ত নির্মোহ দৃষ্টিতে কুরআন অধ্যয়ন, গবেষণা ও পর্যালোচনায় মনোযোগী হন। তাঁর এসব অধ্যয়ন ও গবেষণারই পরিণাম তাঁর 'মানুষের আদি উৎস,' 'বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান' ইত্যাদি গ্রন্থ। তাঁর এ তালিকায় সংযোজিত হল, 'কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান' নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি। খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে আমি গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ সম্পন্ন করি।

এই গ্রন্থের ভূমিকাটি একটু দীর্ঘ হল। তা বিষয়টি আরো বিস্তৃত ও

ব্যাপকভাবে বোঝার স্বার্থেই। ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক মদীনায় ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত আমার 'জ্ঞান বিজ্ঞানচর্চায় কুরআনের মর্মবাণী 'শীর্ষক প্রবন্ধখানি এর ভূমিকায় সংযোজিত হল। অতীব দুঃখের বিষয় যে, 'জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় হাদীসের মর্মবাণী' 'শীর্ষক ৭০ পৃষ্ঠার একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ আমার হারিয়ে যায়। তা আর কোনোদিন খুঁজে পাওয়া যাবেনা, আর লিখতেও পারব না কোনদিন। সেটি থাকলে এ গ্রন্থে সংযোজন করা যেতো। তা থেকে আমি বঞ্চিত হলাম, বঞ্চিত হবেন আমার পাঠকবর্গও। এ গ্রন্থের সুদীর্ঘ ভূমিকার দ্বিতীয় অংশটি আমি সংকলন করে দিয়েছি— যাতে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে মহানবীর (সাঃ) বহু সংখ্যক বাণী লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাতে পাঠকবর্গও উপকৃত হবেন।

তৃতীয় অংশটি এ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত একটি আলোচনা মাত্র। সবশেষে ধন্যাবাদ জানাই, আরমান বুক হাউসের পরিচালক জাকারিয়া ফরাজী সাহেবকে। খুব কম সময়ের মধ্যে গ্রন্থটি প্রকাশ করে তিনি বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের কাছে ধন্যাবাদার্হ হয়ে গেলেন। গ্রন্থটি পাঠক-সমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হলে আমাদের সকলের শ্রম ও সাধনা সফল হবে বলে মনে করি।

৪৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ বিনীত

১ জানুয়ারী ২০০০ ইং **মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস**

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আরম্ভ— যিনি অসীম দয়ালু, অতীব কৃপাময়।

বিষয়বস্তু

এ গ্রন্থে ডক্টর বুকাইলী পবিত্র কুরআনের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয়ের উল্লেখ করেছেন। তাঁর নিজের ভাষায় ঃ 'প্রারম্ভে ইসলামের প্রতি আস্থা নয়; বরং সত্যের সরল অনুসন্ধানই আমাকে পথ প্রদর্শন করেছে। আজও আমি এই পদ্ধতিই অনুসরণ করে থাকি। এ ছিল সেই প্রকৃত তথ্য, অধ্যয়ন সমাপ্ত হওয়ার পর যা থেকে এ সত্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়ে গেছে যে, কুরআন বাস্তবিকই এক পয়গাম্বরের উপর অবতরিত এক মহান গ্রন্থ।' এই সত্যে পৌঁছাবার পূর্ব পর্যন্ত কল্পনাও করা যেত না যে, মুহম্মদের (সাঃ) যুগে কোনো ব্যক্তি সেই যুগে উপলব্ধ জ্ঞান বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে এমন সব বক্তব্য লিপিবদ্ধ করতে পারতেন।

তাঁর গবেষণার জন্য ডঃ বুকইলী পবিত্র কুরআনের সেই আয়াতগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন যেগুলিতে বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত রয়েছে এবং সৃষ্টি, খগোলশাস্ত্র ও বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে।

সৃষ্টি প্রসঙ্গে তিনি সেই সকল পুরানো পাশ্চাত্য ধারণা (তা সে বিবেচনা প্রসূত বা অজ্ঞানতা প্রসূত যাই হোক না কেন) নস্যাৎ করে দিয়েছেন যাতে বলা হয়েছে মুহম্মদ (সাঃ) কেবল বাইবেল প্রদত্ত ধারণাকেই অনুসরণ করেছেন। বাইবেল ও কুরআনের তুলনামূলক গবেষণার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বাইবেলের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআনের বক্তব্য আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সাথে শুধু মেলে তাই নয়; বরং এর সাথে যুগে যুগে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণাগুলি থেকেও একেবারেই মুক্ত। তিনি সাথে সাথে এ প্রশ্নও উত্থাপন করেছেন যে, এটা কী কল্পনাও করা যেতে পারে যে, এক ব্যক্তি বাইবেল থেকে প্রেরণা গ্রহণ করেছেন, আবার তিনি কুরআনেরও রচয়িতা হতে পারেন? এবং তিনি নিজের মতো করে বাইবেলের বক্তব্য সংশোধন করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির

বিষয়ে এক সাধারণ ধারণার বিকাশ ঘটাতে পারেন। যে ধারণা তাঁর মৃত্যুর এত শতাব্দী পরেও বেঁচে থাকতে পারে?

লিখিত গ্রন্থে আজকের যুগের বৈজ্ঞানিকদের জন্য বিশেষভাবে তথা আধুনিক মানুষের জন্য এক মূল্যবান সংবাদ রয়েছে, একথা কখনো বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়, যেমন লেখক নিজে সাবধান করে দিয়েছেন যে, পবিত্র কুরআন কখনো একথা বলে না যে, তাকে বিজ্ঞানের একটি আকরগ্রন্থ বলেই মনে করা হোক; বরং এ অতি উত্তম এবং অতুলনীয় ধর্মীয় গ্রন্থ। কুরআন যদি মানুষের দৃষ্টিগোচর প্রাকৃতিক সৃষ্টিরাজিকে উপলব্ধি করার আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে, তা কেবল আল্লাহর সর্বশক্তিমান সত্তার প্রতিই জোর দেওয়া হয়েছে। এই বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের দৃষ্টিতে সেই সত্যই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যার সাথে বৈজ্ঞানিক সত্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এ তথ্য বাস্তবিক এক ও অদ্বিতীয় ঐশ্বরিক উপহার, যার মহত্বকে আজকের এই ভৌতিকতাবাদী ও নাস্তিকতাবাদী যুগেও আলাদাভাবে চিনে নেওয়া যাবে।

কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান

১৯৭৬ সালের ৯ নভেম্বর ফ্রান্সের আয়ুর্বিজ্ঞান একাডেমিতে "কুরআনে শারীর-বিজ্ঞান ও ভ্রূণবিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য" নামে এক অভূতপূর্ব বক্তৃতামালার আয়োজন করা হয়। আমি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত শারীর বিজ্ঞান ও প্রজনন সম্পর্কিত বক্তব্যের উপর আমার গবেষণাকর্ম প্রস্তুত করি। এই গবেষণাকর্মের প্রধান কারণ আমার দৃষ্টিতে এটাই ছিল যে, প্রস্তুত বিষয়ে আজ আমাদের জানাশোনার পরিধি এতটাই বিস্তৃত যে, সাধারণভাবে এর কারণ নির্ণয় করা একেবারেই অসম্ভব। কুরআন যে যুগের গ্রন্থ, সে যুগের অন্য কোনো গ্রন্থে এমন বিচার ও ধারণা লাভ করা— আধুনিক বিজ্ঞান আজ যার অনুসন্ধান চালায়।

আধুনিক যুগের পূর্বকালেও মানবরচিত এমন কোনো গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না যার জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত কোনো সিদ্ধান্তের তুলনা কুরআনের সাথে করা যেতে পারে।

এ ছাড়া একথাও উচিত সম্মত বলে মনে হয়েছে যে, বাইবেল বর্ণিত এসব তথ্যাবলীরও তুলনামূলক গবেষণা করা উচিত। এভাবে আধুনিক জ্ঞান ও তৌহিদবাদী বা একেশ্বরবাদী ধর্মগুলির পবিত্র গ্রন্থাবলীতে প্রাপ্ত তথ্যাবলী অধ্যয়ন ও গবেষণার পরিকল্পনা করা হয়। এই গবেষণারই ফসল হল 'বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান' নামক এক গ্রন্থ। এর প্রথম ফরাসী সংস্করণ ১৯৭৬ সালে (সেগলার্স, প্যারিস) প্রকাশিত হয়। পরে এটি ইংরেজী, আরবি ও উর্দু ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

এটা কোনো আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয় যে, ধর্ম ও বিজ্ঞান যমজ বোনের মতো এবং আজ এ দুয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক অতি গভীর। এ ছাড়া কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্যের প্রয়োগ পবিত্র কুরআনের মূল পাঠ এবং তার অন্তর্নিহিত গূঢ় ভাবকে ভালোমতো অনুধাবন করতে সহায়তা করে। এই বৈজ্ঞানিক শতাব্দীতে যেখানে বহু সংখ্যক বৈজ্ঞানিক তথ্য মানুষের ধর্মীয় চেতনার মূলে আঘাত হেনেছে সেখানে ঐ সব বৈজ্ঞানিক গবেষণাই পবিত্র ইসলামের তথ্যাবলীকে অসাধারণ ও আল্লাহর মহিমার মহান প্রকাশ বলে

প্রমাণ করেছে। লোকে যাই বলুক না কেন, একথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, এ সব বৈজ্ঞানিক গবেষণা আল্লাহর মহিমময় প্রকাশকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে আরো সাহায্য করেছে।

আজ যখন আমরা পূর্বের কোনো পক্ষপাতমূলক ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করি আধুনিক বিজ্ঞান থেকে আমরা কোন আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করি। (যেমন অতিলঘু The infinity small এর ধারণা অথবা জীবন-সমস্যা ইত্যাদি), তাহলে এ বিষয়ে চিন্তাভাবনার অনেক সূত্র লাভ করা যাবে। যখন আমরা জন্ম ও জীবনের সাথে সম্পর্কিত অসাধারণ ব্যবস্থাবলী সম্পর্কে চিন্তা করি, তখন এসব বিষয়ে যেমন এসব ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। তখন বিস্মিত রূপে বুঝতে পারি যে, এসব ব্যবস্থা পরস্পর-পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কেরই পরিণাম। উদাহরণত, এক ফরাসী চিকিৎসা বিজ্ঞানী, যিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, তিনি একথা জনসাধারণকে বোঝাতে চাইছিলেন যে, কিছু বিশেষ বাহ্যবস্তুর প্রভাবের কারণে কিছু সাধারণ রসায়নিক বস্তুর সংস্পর্শে প্রতিক্রিয়ার ফলে জীবনের উৎপত্তি সাধন হয়েছে। তারপর, এ দাবীও করা হয়েছে যে, কালান্তরে অনবরত পরিবর্তন সাধনের মধ্য দিয়ে দেহধারী জীব, এমন কি অসাধারণ জটিল জীব মানুষেরও উৎপত্তি হয়েছে। আমার কাছে তো একথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উচ্চ শ্রেণীর অত্যন্ত জটিল জীবগুলিকে বোঝার ব্যাপারে বিজ্ঞান যে উন্নতি করেছে, তা থেকে তাদের বিরোধী মত এবং সিদ্ধান্তগুলি আরো প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। অন্য কথায় এক বিলক্ষণ নিয়মবদ্ধ ব্যবস্থার সপক্ষেই প্রমাণ মিলে যাচ্ছে। বাস্তবিকই তাঁর হাতেই গোচর জীবন সংযোজনের মূল সঞ্চালন সূত্রটিই নিহিত রয়েছে।

পবিত্র কুরআন কিছু স্থলে সহজ সরল ভাষায় আমাদের এরকম সিদ্ধান্তের দিকেই নিয়ে যায়। শুধু তাই নয়; বরং এর অতিরিক্ত অত্যন্ত সঠিক পরিসংখ্যানও এতে মজুত রয়েছে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে সে ধারণা পুষ্টিলাভ করছে। এ সেই বস্তু, যার প্রতি আজকের বিজ্ঞানীরা চুম্বকের মতো আকর্ষণ অনুভব করছেন।

কুরআন অধ্যয়নের জন্য বিস্তৃত জ্ঞানের প্রয়োজন

কয়েক শতাব্দী যাবৎ মানুষ এমন অবস্থায় পৌঁছাতে পারেনি, যে অবস্থায় সে কুরআনে উল্লেখিত বিষয়গুলি গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে পারত; কারণ তাদের কাছে পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক সাধনের অভাব ছিল। প্রাকৃতিক বিষয়াবলীর সাথে সম্পর্কিত আয়াতগুলির বিস্তৃত অর্থ তো বর্তমানকালেই অনুধাবন করা সম্ভব হচ্ছে। আমি তো একথাও পর্যন্ত বলব যে, বিংশ শতাব্দীতে যেখানে অনবরত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলীকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, এক সাধারণ বৈজ্ঞানিকের জন্যও যখন পর্যন্ত সেই গবেষণা-কর্মের সহায়ক না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ সব বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত বস্তুগুলিকে অনুধাবন করা মোটেও সহজ হবে না, যা সে কুরআন অধ্যয়নের দ্বারা জানতে পেরেছে। এর অর্থ এই যে, কুরআনের এ সমস্ত আয়াতের অর্থ অনুধাবনের জন্য যে কোনো ব্যক্তির জন্যই বহুবিধ জ্ঞান আবশ্যক। এর দ্বারা আমি একথাই বোঝাতে চাচ্ছি যে, সে জ্ঞান হবে বহুবিষয় সম্পর্কিত এবং বহুধাবিস্তৃত।

আমি "বিজ্ঞান" শব্দটি সেই জ্ঞানের জন্য ববহার করছি, যা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। যা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষের মত বা পরিকল্পনা দ্বারা পুষ্ট নয়। যা কিছু সময়ের জন্য কোনো প্রাকৃতিক প্রতিভাস বা প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঘটনাবলীর কোনো শৃঙ্খলার কারণ অনুসন্ধানের সহায়ক বলে সিদ্ধ হয়, যাতে পরে ঐ সব নবীর ধারণাবলী পরিত্যক্ত বলে প্রতীয়মান হয়, যা বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির কারণে অধিক যুক্তিযুক্ত ও সমাদৃত বলে প্রতীত হয়। মূল রূপ থেকে আমি কুরআনের বক্তব্য ও তা থেকে উপলব্ধ জ্ঞানের আলোকে তুলনামূলক অধ্যয়ন প্রস্তুত করতে চাই, যা থেকে পরে এ বিষয়ে কোনো বাদ-বিবাদ ও মতদ্বৈধতার সম্ভাবনা না থাকে। সে সব স্থানে আমি এসব বৈজ্ঞানিক তথ্য পেশ করব, যা আজো পরিপূর্ণভাবে (শতকরা ১০০ভাগ) সিদ্ধ ও সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি, সেখানে আমি তা অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে পেশ করব।

পবিত্র কুরআনে এমন কিছু অসাধারণ বক্তব্যও আছে, যা আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা আজো পরিপূর্ণরূপে পুষ্টিলাভ করতে পারেনি। সে বিষয়ে আমি বলব, যে সমস্ত প্রমাণ বিজ্ঞানীদের যে পথ প্রদর্শন করছে, তা এই যে, সে বক্তব্য খুবই সূক্ষ্ম। এ প্রসঙ্গে একটা উদাহরণ এই যে, কুরআনের বর্ণনা হল, জীবন জলীয় পদার্থ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। দ্বিতীয় বক্তব্য হল যে, মহাবিশ্বে আমাদের পৃথিবী গ্রহের মতো আরো বহু গ্রহের অস্তিত্ব রয়েছে।

এসব বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের কারণে আমরা একথা যেন কখনোই ভুলে না যাই যে, কুরআন এক উৎকৃষ্ট ধর্মগ্রন্থ আর স্বাভাবিকভাবে, এমনটি ভাবা কখনোই উচিত হবে না যে, তা কেবল বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত একটি মহাগ্রন্থ। যেখানে কোনো সৃষ্টিকার্য এবং সুস্পষ্ট কোনো বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে বিচারের জন্য মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, সেখানে এসব উদাহরণের উদ্দেশ্য কেবল আল্লাহর অস্তিত্বের সর্বব্যাপকতার প্রতি জোর দেওয়া। এসব তথ্যের বিচার এবং চিন্তাভাবনা দ্বারা আমাদের কাছে ঐ সব সামগ্রীর সংকেত মিলতে পারে, বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলীর সাথে যার সম্পর্ক রয়েছে, বাস্তবে তা আরো একটি ঐশ্বরীয় উপহার, যার মূল এবং শ্রেষ্ঠত্বের আলোকময় প্রকাশ এমন যুগেই হওয়া উচিত, যাতে বিজ্ঞানের সহায়তা নিয়ে জড়বাদী নাস্তিকরা ঈশ্বরের স্বরূপ অনুভব ও উপলব্ধি করতে পারে এবং নিজেদের ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা ত্যাগ করে তাঁর শাসন ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিজেদের স্থাপিত করতে পারে।

আমি আমার গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিরন্তর নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করেছি। আমার বিশ্বাস যে, কুরআন অধ্যয়ন করলে আমি কামিয়াব হতে পারব। যেমন নিরপেক্ষভাবে একজন চিকিৎসক তার রোগীর রোগ অনুসন্ধান করেন। অন্য কথায়, রোগীর সমস্ত লক্ষণ অনুসন্ধানের পর তিনি তার রোগ নির্ণয় করে নিদান দিতে পারেন। আমি স্পষ্টই স্বীকার করছি যে, বাস্তবিকই ইসলামে আমার কোনো আস্থা ছিল না। যা প্রারম্ভেই আমার পথ প্রদর্শন করতে পারত। এবং আজ আমার একথাই প্রতীত হচ্ছে যে, এটাই ছিল সেই আসল তথ্য যা আমাকে একথাই অনুভব করাল যে, পবিত্র কুরআন এক পয়গাম্বরের উপর অবতীর্ণ আল্লাহর বাণী।

আমি পবিত্র কুরআনের সে সব বাণীই পরীক্ষা করব, যাতে বিশেষভাবে বৈজ্ঞানিক তথ্য লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক যুগের লোকেরা তার কেবল বাইরের অর্থই অনুধাবন করতে পারত। এ কল্পনা কিভাবে করা যায় যে, কুরআনের কোনো কখনো পরিবর্তন হয়েছে? যদি তাই হয়, তাহলে যার গূঢ়ার্থপূর্ণ অংশ পবিত্র কুরআনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, মানুষের ছলনা-কপটতা-চতুরতা থেকে আত্মরক্ষা করে কিভাবে তার অস্তিত্ব বজায় রাখল? পাঠ বা আবৃত্তিতে সামান্যতম উচ্চারণ-বিকৃতি ঘটলেই সহজেই যা কানে ধরা পড়ে– যা তার চিরন্তন বিশিষ্টতা– আর আমরা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে তার পুষ্টি সাধনে অসমর্থ রয়ে গেলাম। এসব বক্তব্য পবিত্র কুরআনের মধ্যে একসাথে পেয়ে যাওয়াটা একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির জন্য কুরআনের প্রামাণিকতার স্পষ্ট চিহ্ন। পবিত্র কুরআন এমনই এক শিক্ষার ধারা যার পরিচয় যথাক্রমে অবতরণ ও প্রকাশনার (Revelation) মাধ্যমে মানবজাতির কাছে এসে পৌঁছেছে এবং সময়ের ধারাবাহিকতায়, কুড়ি বছর পরে দুই বিভক্ত সময়কালের মধ্যে যার ব্যাপ্তি। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে এটাই স্বাভাবিক ছিল যে, বিচার এবং মনন হেতু বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি সমগ্র গ্রন্থে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। এরকম গবেষণাকর্মের জন্য, আশা করেছিলাম, আমরা এক এক সূরা থেকে সেগুলিকে জমা করে বিষয়ানুসারে সেগুলির শ্রেণীবিভাগ করি।

ওগুলিকে কিভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়? এ সম্পর্কে কোনো বিশেষ প্রকারের শ্রেণীকরণের পরামর্শ আমরা কুরআনের মধ্যে পাইনি। অতঃপর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, সেগুলিকে আমার সুবিধামতো সাজিয়ে নেবো।

আমার বিবেচনায় সর্বপ্রথমে সৃষ্টিবিষয়ক আয়াতগুলি বিবেচনা করা উচিত বলে প্রতীত হয়। এই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত আয়াত ও মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে বর্তমানে প্রচলিত ধ্যান-ধারণাগুলির তুলনামূলক অধ্যয়ন বা গবেষণা করতে আমি উদ্বুদ্ধ হই। দ্বিতীয়ত, বিষয়ভিত্তিকভাবে আয়াতগুলিকে আমি ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে সন্নিবেশিত করি। যেমন– জ্যোতির্বিজ্ঞান, পৃথিবী, জীবজন্তু ও উদ্ভিদ জগৎ, মানুষ বিশেষত, প্রজনন প্রক্রিয়া। শেষ বিষয়টিকে পবিত্র কুরআনে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। উক্ত বিষয়টিকে আরো একাধিক উপশিরোনামে উল্লেখ করা যেতে পারে।

তারপর আমার বিবেচনায় আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে কুরআন ও বাইবেলের বর্ণনা এবং বক্তব্যের তুলনামূলক অধ্যয়ন জরুরী বলে প্রতীত হয়।

ব্রহ্মাণ্ড বা মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব

আসুন, প্রথমে আমরা সৃষ্টি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা এবং বক্তব্য অবলোকন করি।

এ প্রসঙ্গে আমাদের সামনে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অথচ সাধারণ একটি সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এসব বক্তব্য বাইবেলের বর্ণনা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এসব কথা তথাকথিত সম-ধারণারও বিরুদ্ধ, যাকে পাশ্চাত্য লেখকরা সম্পূর্ণ ভ্রান্তভাবে কেবল এ জন্যই সামনে রাখেন, যাতে দুটি গ্রন্থই সমান বলে প্রমাণ করতে পারেন। পাশ্চাত্যের লেখকদের একটা দৃঢ় অথচ ভ্রান্ত প্রবৃত্তি হল এই যে, অন্যান্য বিষয়াবলীর ন্যায় সৃষ্টি সম্পর্কেও কথা বলতে গিয়ে দাবী পেশ করে বসেন যে, মুহম্মদ বাইবেলের সামান্য ছাইভস্মকেই নকল করেছেন মাত্র। নিঃসন্দেহে বাইবেলে বর্ণিত সৃষ্টির দিনকে ছয় এবং এর অতিরিক্ত এক– সপ্তম দিন, যাকে ঈশ্বরের আরামের দিন বলে মান্য করা হয়; তার তুলনা পবিত্র কুরআনের সূরা আল আরাফ (৭ ঃ ৫৪)-এর একটি আয়াত থেকে করা যায় ঃ

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

অর্থাৎ ঃ তোমাদের প্রভু আল্লাহ, যিনি পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন।

এখানে আমাদের একটা কথা খোলাসা করা হবে যে, 'আইয়াম' যার অর্থ দিনও হয়, আধুনিক টীকাকারদের মতে, এর অর্থ 'লম্বা অবধি' তা চব্বিশ ঘন্টার সময়ের সমান নয়।

মূলরূপে যে কথাটি আমার কাছে অতীব গুরত্বপূর্ণ বলে মনে হয় তা হল যে, বাইবেলের বিপরীতে কুরআনে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টির কোনো ধারাবাহিকতা দেয়া হয়নি। কুরআন যখন সাধারণভাবে সৃষ্টির উল্লেখ করে তখন কখনো আকাশের আগে পৃথিবীর বর্ণনা করে থাকে,

আবার কখনো পৃথিবীর আগে আকাশের বর্ণনা করে থাকে। যেমন সূরা ত্বাহায় (২০ ঃ ৪) আছে ঃ

تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى *

অর্থাৎ ঃ 'তাঁর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ যিনি নিচে পৃথিবী এবং উর্ধ্বে আকাশ সৃষ্টি করেছেন।'

নিশ্চয়ই কুরআনের বর্ণনা থেকে এমন আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে, পৃথিবী ও আকাশের বিকাশ এক সাথে হয়েছে। এ থেকে কিছু এমন মৌলিক সিদ্ধান্তও পরিসংখ্যানও পাওয়া যায়, যার সম্পর্কে প্রারম্ভিক গ্যাসীয় চাঁদের সাথে যা অদ্বিতীয় (Unique), যার তত্ত্ব– প্রথমে পরস্পরে মিলেমিশে ছিল, এবং পরে পৃথক পৃথক হয়ে গেছে।

এ ধারণা সূরা হা, মীম, আস সজদায় (৪১ ঃ ১১) ব্যক্ত হয়েছে ঃ

ثُمَّ اسْتَوٰى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ

অর্থাৎ ঃ 'আল্লাহ আকাশের দিকে যখন মুখ করেন তখন তা ছিল ধোঁয়াশাচ্ছন্ন।'

একথা অন্য এক সূরায়– সূরা আল আম্বিয়াতেও উক্ত হয়েছে ঃ

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا

অর্থাৎ ঃ 'কাফিররা কি একথা জানেনা যে, পৃথিবী ও আকাশ পরস্পরের মধ্যে সম্বদ্ধ ছিল এবং তারপর আমরা তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি?'

এই বিচ্ছিন্নতা থেকে কয়েকটি দুনিয়া মূর্তিমান হয়েছে একথা পবিত্র কুরআনে বহুবার উল্লেখিত হয়েছে। একথা তো সূরা আল ফাতিহা-র (১ঃ১) প্রথম অনুবাক্যের রূপে এসেছে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ *

অর্থাৎ ঃ 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি সমস্ত জগতের প্রভু।'

এসব কথা আধুনিক ধ্যান-ধারণার সাথে সম্পূর্ণ মিলে যায় যে,

সৃষ্টিজগৎ কিভাবে প্রারম্ভিক কালে কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থায় ছিল, এবং তারপরে কোন প্রক্রিয়ায় তা পৃথক হয়ে গেল যা থেকে প্রাথমিক সৃষ্টিসৌধ জন্মলাভ করল, এই বিভাজন থেকে নক্ষত্ররাজি জন্ম নিল, তারপর জন্ম নিল গ্রহরাজি। পবিত্র কুরআনে সূরা আল ফুরকান (২৫: ৫৯) -এ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যেকার অন্যান্য সৃষ্টিরাজি সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمٰنُ فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا

অর্থাৎ ঃ 'যিনি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে তা ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন।'

মনে হয় যে, 'মধ্যেকার এ সৃষ্টি' সুসংবদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় পদ্ধতির বাইরে আধুনিক অনুসন্ধান দ্বারা প্রাপ্ত পদার্থ-সেতু সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে।

এই পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায় যে, আধুনিক পরিসংখ্যান এবং কুরআনের বয়ানের মধ্যে অনেক ব্যাপারে মতৈক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। এরকমই আমরা বাইবেলের অসমর্থনযোগ্য বয়ান থেকে কিছুটা আগে অগ্রসর হয়েছি। প্রকৃতপক্ষে, বাইবেল বলে, আকাশ সৃষ্টির পূর্বেই পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল। অর্থাৎ তৃতীয় দিন, আকাশের পরে হয়, অর্থাৎ চতুর্থ দিন। সেহেতু এ তথ্য থেকে জানা গেল যে, আমাদের গ্রহ তার নক্ষত্র সূর্য থেকে সৃষ্ট হয়েছে। এমতাবস্থায়, আমরা এমন কোনো ব্যক্তির কল্পনা করতে পারি যিনি বাইবেল থেকে প্রেরণা নিয়েছেন এবং তার নিজস্ব পদ্ধতিতে বাইবেলের সৃষ্টি সম্পর্কিত বক্তব্যকে সংশোধন করে তাকে এমন সাধারণ ধারণারূপে পেশ করেছেন, যার সন্ধান তার মৃত্যুর বহু শতাব্দী পরেও করা হতে পারে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান-প্রকাশ ও গতি

এবার আমরা জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রসঙ্গে আসব।

যখন আমি কুরআনে বর্ণিত জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিবরণ পাশ্চাত্যের লোকদের সামনে পেশ করি, তখনই কিছু লোক সাথে সাথে

বলে দেয় যে, এ কোনো নূতন কথা নয়; কেননা, আরবরা এ ব্যাপারে ইউরোপীয়দের আগে থেকেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকার্য চালিয়েছিল।

বাস্তবিকই এ বড়ই ভুল ধারণা, ইতিহাস-সম্পর্কিত অজ্ঞতাই এর মূল কারণ। প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য এই যে, আরবে বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটেছে পবিত্র কুরআন অবতরণের পর। দ্বিতীয়ত, তার উপরে ভিত্তি করে কোনো ব্যক্তির পক্ষে আকাশ সম্পর্কিত বিষয়ে এমন সঠিক ও অভ্রান্ত ধারণা পেশ করা সম্ভব ছিল না। যা পবিত্র কুরআনে মজুদ রয়েছে।

এখানেও এ বিষয়টি আমি বিস্তারিতভাবে পেশ করব।

সূর্য ও চাঁদ প্রসঙ্গে বাইবেলের বয়ান হল যে, এ দুটিই আলোকময়, যদিও তাদের আকার ভিন্ন। পবিত্র কুরআন বিভিন্ন গুণসূচক নাম দ্বারা সেগুলির পার্থক্য নিরূপণ করেছে। এখানে চাঁদ প্রসঙ্গে 'নূর' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে এবং সূর্য সম্পর্কে 'সিরাজ' (প্রদীপ) শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে; প্রথমটি নিষ্ক্রিয় পিণ্ড, যার প্রকাশ কেবল প্রতিফলিত (Reflect) আলোকরূপে। দ্বিতীয়টি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক যা সতত আলোকময় উত্তেজক এবং উত্তপ্ত।

'জিম' (তারা) শব্দটি 'সাকিব' নামক অন্য একটি শব্দের সাথে মিশে রয়েছে, যা থেকে বোঝা যায় যে, তা জাজ্জ্বল্যমান– এবং রাতের অন্ধকারের বুক চিরে নিজের অস্তিত্বকে রক্ষা করে।

কুরআনে 'কৌকব' শব্দটি থেকে আকাশের এমন একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে বোঝানো হয়েছে যা আলোকে প্রতিফলিত (Reflect), তা সূর্যের মতো নিজস্ব আলোক বিতরণ করে না।

আজ আমরা ভালোরকম জানি যে, আকাশীয় সংগঠন অত্যন্ত সমতাপ্রাপ্ত। তারকাদের নিজ নিজ গতিপথ রয়েছে। তাদের আকার ভার এবং নিয়মিত গতি অনুসারে তাদের নিজ নিজ আকর্ষণ-শক্তি রয়েছে। এসব আকাশের গঠনের সাথে অত্যন্ত সামঞ্জস্যশীলতা পরস্পরের মধ্যে সমতা রক্ষা করে চলে। এসব তথ্য সঠিকভাবে আমরা এ যুগেই জানতে পেরেছি। পবিত্র কুরআন আজকের পরিভাষায় নয়; বরং নিজস্ব ঢঙে নিজস্ব মহিমান্বিত ভাষায় উল্লেখ করেছে ঃ

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ *

অর্থাৎ ঃ 'এবং তিনিই রাত ও দিন সৃষ্টি করেছেন এবং সূর্য ও চাঁদ (তাঁরই সৃষ্টি)। সবাই সাঁতার কাটছে নিজ নিজ কক্ষপথে।' (২১ ঃ ৩৩)

এই গতির কথা প্রকাশ করতে গিয়ে যে আরবি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা হল 'সাবহা' (মূলে ইয়াসবাহুন)। এর দ্বারা চলমান বস্তুর গতির কথা বোঝানো হয়ে থাকে। তা যে পৃথিবীতে স্থলভূমিতে দৌড়ানো গতিই হোক অথবা পানিতে সাঁতারজনিত গতিই হোক। নক্ষত্রপুঞ্জের জন্য এর আসল অর্থ গ্রহণ করতে মানুষ বাধ্য; অর্থাৎ কোনো কিছুর আপন গতিতে পথ চলা।

রাত ও দিনের আগমন নির্গমনের বর্ণনাটি মামুলি বলে মনে হতো যদি এর অভিব্যক্তি অনুসারে এমন শব্দের ব্যবহার না হতো, যা আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পবিত্র কুরআনে সূরা 'আজ-জুমার' (৩৯ ঃ ৫)-এ এটি বোঝাতে 'কওয়ার' ক্রিয়ার ব্যবহার একথা বোঝানোর জন্যই হয়েছে যে, রাত দিনকে অনুসরণ করে এবং দিন রাতকে। এটা ঠিক ঐরকমই একটি প্রক্রিয়া যেভাবে মাথাকে পাগড়ি দিয়ে জড়ানো হয়। এই শব্দটির একটি মৌলিক অর্থও রয়েছে। এই সমরূপতার তত্ত্ব সন্দেহাতীতভাবে সঠিক। (যদিও) যে যুগে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, সে যুগে অর্থ এসব জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় পরিসংখ্যান মানুষের জানা ছিল না, তা সত্ত্বেও এর সমরূপতা আনার জন্য এসব তথ্য অনিবার্য ছিল।

আকাশমণ্ডলীর বিকাশ এবং সূর্যের সতত একই স্থানে অবস্থানের তত্ত্ব পবিত্র কুরআনেও উল্লেখিত হয়েছে। এটা এমন একটা জিনিস যা অত্যন্ত বিস্তৃত আধুনিক ধারণাসমূহের সাথে সম্পূর্ণ মিলে যায় এবং তাকে সমর্থনও করে। এমন মনে হয় যে, কুরআন এ বিষয়ে আরো সংকেত দেয় যে, মহাবিশ্ব সতত সম্প্রসারণশীল।

মহাকাশ বিজয়ের উল্লেখও পবিত্র কুরআনে পাওয়া যায়। ব্যবহারিক জ্ঞানের বিপুল উন্নতির ফলে এখন তা সম্ভব হয়েছে, যার ফলস্বরূপ মানুষ চাঁদে পদার্পণ করতে সক্ষম হয়েছে। সূরা আর-রাহমান (৫৫ ঃ ৩৩) অধ্যয়ন করার সাথে সাথেই এ বাস্তব সত্যটি আমাদের চোখের সামনে

ভেসে ওঠেঃ

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ *

অর্থাৎ ঃ "হে জ্বিন ও মনুষ্য সম্প্রদায়! তোমাদের আকাশ ও পৃথিবীর বাইরে চলে যাওয়ার সামর্থ্য থাকলে চলে যাও। তোমরা আমাদের শক্তির (সহায়তা ছাড়া) ছাড়া যেতে পারবে না।"

এ শক্তি সর্বশক্তিমান আল্লাহ থেকেই পাওয়া সম্ভব। এই সূরাটির মূল বিষয়ই হল মানুষের প্রতি আল্লাহর মেহেরবানিকে তুলে ধরা যাতে প্রকৃতপক্ষেই তারা তাদের প্রভুকে চিনতে পারে এবং স্বীকার করে নেয়।

পৃথিবী

এবার আমরা পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। উদাহরণ স্বরূপ সূরা 'আজ-জুমার' (৩৯; ২১) থেকে উদ্ধৃতি পেশ করি ঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ

অর্থাৎ ঃ "তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, তারপর পৃথিবীতে তার স্রোত বইয়ে দেন? তারপর তার দ্বারা নানা রঙের ফসল বেরিয়ে আসে।"

আজ সম্পূর্ণভাবেই একথা আমাদের কাছে অত্যন্ত বাস্তব এবং প্রাকৃতিক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। কিন্তু একথা অস্বীকার করা উচিত নয় যে, এর আগে আমরা তা জানতাম না। শতাব্দীর প্রারম্ভে বানার্ড পেলিসি (Bernard Palissy) জলচক্র প্রসঙ্গে সুসঙ্গত তথ্য প্রকাশ করেন। এর আগে প্রচলিত ধারণা ছিল সমুদ্রের পানি হাওয়ার প্রভাবে মহাদেশগুলির অভ্যন্তরভাগ পর্যন্ত পৌছে যায় এবং পরে তা প্রবাহিত হয়ে সমুদ্র পর্যন্ত পৌছে যায়। প্লেটোর সময় থেকে এই তত্ত্ব টারটারস (Tartarus) বলে অভিহিত হয়ে এসেছে। সপ্তদশ শতকের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডেসকারটসও

(Descartes) এ তত্ত্বকে সত্য বলে বিশ্বাস করতেন। এমন কি উনবিংশ শতাব্দীতে অ্যারিস্টটলের এ তত্ত্বও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল যে, পানি পাহাড়ি গুহাগুলিতে বরফের আকারে জমা থাকে এবং তা গলে মাটিতে বিরাট বিরাট ঝিলে জমে থাকে। সেখান থেকে প্রবাহিত স্রোত থেকে পানি পাওয়া যায়। আজ আমরা জানি যে, এসব প্রবাহ মূলরূপে বৃষ্টির পানি থেকে প্রবাহিত হয়। যদি আধুনিক পানিবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের তুলনা এ বিষয়ে প্রাপ্ত কুরআনী তত্ত্বের সাথে করা হয় তাহলে এ দুয়ের মধ্যে গভীর মিল লক্ষ্য করা যাবে।

ভূগর্ভ বিজ্ঞানের অন্তর্গত ওই তথ্য যাকে গর্ভস্তর বলে অভিহিত করা হয়, তাই পর্বতমালা সৃষ্টির মূল কারণ বলে প্রমাণিত হয়েছে। ভূপৃষ্ঠ সম্পর্কে এটাই হল প্রকৃত সত্য তথ্য, যা এক পরিপূর্ণ গর্ভের মতো, যার মধ্যে আমরা অবস্থান করতে পারি, যার অভ্যন্তরভাগ গরম এবং তরল। আর এ থেকে এ তথ্যও অবগত হওয়া যায় যে, পর্বতের স্থায়িত্বের সম্পর্ক রয়েছে এসব স্তরের সাথে। এসব আধুনিক ধ্যান ধারণার সাথে সম্পৃক্ত বহু আয়াত পবিত্র কুরআনে মজুদ রয়েছে। সূরা 'আন-নাবা' (৭৮-৬-৭) থেকে একটি আয়াত উদ্ধৃত করছি ঃ

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا * وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا *

অর্থাৎ ঃ 'আমরা কি এই পৃথিবীকে বিছানা আর পর্বতগুলিকে খুঁটির ন্যায় দৃঢ়ভাবে স্থাপন করিনি?

খুঁটি (আওতাদ) বা গ্রাফীন– তাঁবুকে মাটির সাথে মজবুত করে বাঁধার জন্য পোঁতা হয়ে থাকে, যা ভূগর্ভে মাটির স্তরের সাথে মিলে গিয়ে সুদৃঢ় হয়ে থাকে।

এখানেও অন্য বিষয়ের মতো নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গীতে বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সাথে কুরআনের বাণীর কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

কিন্তু সবার আগে সর্বপ্রথমে আমি পবিত্র কুরআনে জীবন্ত বস্তু, প্রাণী এবং বৃক্ষাদি— দুইই, বিশেষত তাদের সন্তান-সন্ততির জন্ম ও উৎপত্তি প্রসঙ্গে বক্তব্যগুলি পড়ে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি।

এ ব্যাপারে এ কথার উপর অধিক জোর দিয়ে আমাকে স্বীকার

করতেই হবে যে, আধুনিক যুগই বিশেষত, বিজ্ঞানের অগ্রগতিই এ ধরনের আয়াতে বর্ণিত বিষয়গুলিকে আরো বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা দিয়েছে। এরকম আয়াত আরো অনেক আছে, যেগুলি খুবই সহজসাধ্য, কিন্তু অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে সূরা 'আল-আম্বিয়া'-র উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এর এক অংশ পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ط أَفَلَا يُؤْمِنُونَ *

অর্থাৎ ঃ "খোদাদ্রোহীরা কি একথা জানেনা যে, আকাশ ও পৃথিবী পরস্পর সংলগ্ন অবস্থায় ছিল, তারপর আমরা তাকে আলাদা আলাদা করে দিয়েছি এবং আমরা পানি থেকে সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করেছি। তবুও তারা তা বিশ্বাস করবে না?" (২১ ঃ ৩০)

এ বক্তব্য আধুনিক বিজ্ঞানের এই ধারণাকে পুষ্টি দিয়েছে যে, পানি থেকে সমস্ত জীবের উৎপত্তি।

মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে পৃথিবীর কোনো দেশে উদ্ভিদবিদ্যার এতটা অগ্রগতি হয়নি যে, তা থেকে এই বিষয়ের স্বীকৃতি পাওয়া সম্ভব ছিল যে, উদ্ভিদ জগতে নারী ও পুরুষ দুই শ্রেণীরই উদ্ভিদ রয়েছে। আমরা সূরা 'ত্বাহা' (২০ ঃ ৫৩) থেকে আবারো উদ্ধৃতি পেশ করছি ঃ

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى *

অর্থাৎ ঃ "তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা বানিয়ে দিয়েছেন এবং তাতে তোমাদের জন্য রাস্তা করে দিয়েছেন; তাতেই ফলফলাদির বৃক্ষ জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।"

আজ একথা আমরা জানি যে, গাছ-গাছালি থেকেই ফল পাওয়া যায়, যার নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সূরা 'আর রা'দ' (১৩ ঃ ৩) থেকে উদ্ধৃতি পেশ করি ঃ

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ

অর্থাৎ ঃ "এর সমস্ত প্রকার ফলবান বৃক্ষকে আমরা দুই রকম (নারী ও

পুরুষ) করে সৃষ্টি করেছি। তিনিই রাতকে দিনের মধ্যে লুকিয়ে রাখেন। নিঃসন্দেহে চিন্তাশীলদের জন্য তাতে নিদর্শন রয়েছে।"

প্রাণী জগতে সন্তান উৎপাদনের সিদ্ধান্তটি মানব-সন্তান জন্মের সাথে সম্পর্কিত ছিল। এখন আমরা সেদিকেই দৃষ্টিপাত করব। শারীরবিজ্ঞান সম্পর্কিত এমন একটি আয়াত আছে যেটি আমার দৃষ্টিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রক্ত-সঞ্চালন সম্পর্কিত গবেষণায় এক হাজার বছর আগে, এই তথ্যের অনুসন্ধান থেকে প্রায় তেরশো বছর আগের ধারণায়, মাতৃগর্ভে সন্তানের পোষণ ও পুষ্টি যে পাচন-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হত, পবিত্র কুরআনে তা স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে মায়ের দেহে দুধের স্রোত জারি হওয়ার বিষয়েও উল্লেখিত হয়েছে।

এই আয়াত থেকে আমাদের অনুধাবন করা উচিত যে, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মানবদেহ ভোজ্য পদার্থকে অন্তঃসারশূন্য করে খাদ্য রসকে মানবদেহে রক্তরূপে প্রবাহিত করে। আর এসব কাজ এক অত্যন্ত জটিল পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে; বাস্তবিকই তা এক জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। এই হৃদপিণ্ডই রক্তকে শরীরের সর্বত্রই পৌঁছে দেয়, এমন কি স্তনের গ্রন্থিগুলিতেও পর্যন্ত।

বিস্তারিত বর্ণনা না করে আমরা এতটুকুই বলতে পারি যে, অন্ত্র থেকে কিছু পদার্থ অন্ত্রের পথ ধরে মলরূপে বেরিয়ে যায় এবং মূল খাদ্যবস্তু থেকে গৃহীত খাদ্যরস রক্তে রূপান্তরিত হয়ে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআনের সূরা 'আন-নহল'-এর এই আয়াত (১৬ ঃ ৬৬) থেকে আমরা তা প্রমাণ করতে পারি ঃ

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِى بُطُوْنِهِ مِنْ بَيْنِ
فَرْثٍ وَّدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ *

অর্থাৎ ঃ "আর নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য পশুদের মধ্যেও শিক্ষা-সামগ্রী মজুদ রয়েছে। যা কিছু তাদের পাকস্থলীতে আছে, তা থেকে যা কিছু অন্ত্রে সংঘটিত হয়, তার এবং রক্তের মধ্য থেকে আমরা তোমাদের জন্য বিশুদ্ধ দুধ প্রবাহিত করি, যা পানকারীর জন্য অত্যন্ত উপাদেয় বলে সিদ্ধ।"

মানবসৃষ্টি

মানব-প্রজনন বিষয়ে কুরআনের বক্তব্য ভ্রূণ-বিজ্ঞানের জন্য এক শিক্ষাপ্রদ উপাদান, যা তাদের চিন্তার খোরাক জুগিয়ে যাচ্ছে। এসব বক্তব্য অনুধাবনের জন্য যোগ্য ব্যক্তির মস্তিষ্ক থেকে ঐ বিজ্ঞান সম্পর্কিত ধারণাগুলি এক সুসংহত বিজ্ঞানের রূপ লাভ করেছে। এই বিজ্ঞান প্রাণী বিজ্ঞানের মতো একটি বিষয়কে বোঝাতে অনেক সাহায্য করেছে। বিশেষত, সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিগুলি আবিষ্কারের পরে। সপ্তদশ শতকের আগে মানুষের পক্ষে এসব ধারণা লাভ করা ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার। সে যুগের কোনো উপাদান থেকে এ প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, আরবরা সে যুগে ইউরোপ সহ পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে বসবাস করত এবং তারা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এতটা উন্নতি লাভ করেছিল। আজকের যুগে এমন মুসলমান বিজ্ঞানী অনেক আছেন, যিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও কুরআন বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন; তাঁরা প্রজনন বিষয়ে পবিত্র কুরআনের আয়াত ও মানবজ্ঞানের পারস্পরিক সমতাকে স্পষ্টরূপে স্বীকার করেন। আমি সৌদি আরবের অষ্টাদশ বর্ষীয় এক শিক্ষার্থী যুবকের কথা চিরকাল মনে রাখব, যিনি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত প্রজনন ক্রিয়া সম্পর্কে উত্তর দিতে গিয়ে বলেছিলেন। তিনি ঐ বিষয়ে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন— "কিন্তু এ গ্রন্থ আমাদের এ বিষয়ে পুরো তাত্ত্বিক এবং সারগর্ভ জ্ঞান দান করে যাচ্ছে। যখন আমি স্কুলের ছাত্র ছিলাম তখন কুরআনের মাধ্যমে আমাকে বোঝানো হয়েছিল যে, সন্তান কিভাবে পয়দা হয়। আপনাদের কামশাস্ত্রের গ্রন্থগুলিও এ ব্যাপারে অনেক পিছনে রয়ে গেছে।"

এখানে বিশেষভাবে কুরআনের যুগে এ বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কল্পিত ও অন্ধবিশ্বাসপূর্ণ সিদ্ধান্তের তুলনা কুরআনের নিজস্ব সিদ্ধান্ত ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সাথে করলে এক সাংঘাতিক ভ্রম উপস্থিত হবে। কিন্তু গবেষণা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, পবিত্র কুরআনের সিদ্ধান্ত ঐসব প্রচলিত ও ভ্রান্ত ধারণা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। প্রকৃত সত্য হল এই যে, আধুনিক যুগের গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তের সাথে পবিত্র কুরআনের সিদ্ধান্ত আশ্চর্যরকমভাবে মিলে যায়।

এবার আমরা কুরআনের আলোকে বীর্য সম্পর্কিত কঠিন বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব, যা থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারব যে,

এর সামান্য একটি ফোঁটা গর্ভধারণের জন্য কেন যথেষ্ট। এটাই এর সারমর্ম। পবিত্র কুরআনে 'সুলালা' শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে তা বোঝানো হয়েছে।

স্ত্রী জননাঙ্গের অভ্যন্তরে স্থিত ডিম্বাণুর কথাও কিছু আয়াতে যথাযথভাবে 'আলাক' শব্দের প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। ঐ সূরাটির নামও 'আলাক'। এতে বলা হয়েছে ঃ

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ *

অর্থাৎ ঃ "আল্লাহ মানুষকে জমাটবদ্ধ রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন।"

(৯৬ ঃ ২)

আমার বোধগম্য হয়না যে , " আলাক" শব্দটি ছাড়া আব কোন শব্দের দ্বারা এই মৌলিক শব্দটির অর্থ যথাযথ ভাবে বোঝানো যেতে পারে।

মাতৃগর্ভে ভ্রূণ অবস্থা থেকে ক্রমাগত বৃদ্ধি প্রসঙ্গে অতিসংক্ষেপে এখানে একথা বলা হয়েছে, কিন্তু এ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে তা অত্যন্ত বিশুদ্ধ এবং সন্দেহাতীতভাবে সঠিক। কেননা, সহজ সরল শব্দাবলীর প্রয়োগের মাধ্যমে যা কিছু বলা হয়েছে তা ভ্রূণের ক্রমবিকাশের মূল অবস্থার অনুরূপ। এ কথা সূরা 'আল-মুমিনিন' (২৩ ঃ ১০) -এও এসেছে ঃ

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَانٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ *

অর্থাৎ ঃ "এর-পর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে এক নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি, নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়।"

'মাংসপিণ্ড' পরিভাষাটি ভ্রূণের বিকাশের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এর মাধ্যমে আরো জানা গেল যে, মাংসপিণ্ডের অভ্যন্তরে অস্থির অস্তিত্ব বিকশিত হয় এবং মাংস দ্বারা আবৃত হয়। এই মাসংপিণ্ডকেই আধুনিক পরিভাষায় ভ্রূণ বলা হয়ে থাকে।

ভ্রূণ সময়ের সাথে সাথে পদে পদে এইভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে– তারপর পর্যায়ক্রমে তা একটি পূর্ণ মানুষের রূপ ধারণ করে। সম্ভবত, সূরা 'আল-হজ্জ'-এ (২২ ঃ ৫) এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَإِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ

অর্থাৎ ঃ "আমি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাটবদ্ধ রক্ত থেকে।" এরপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থেকে তারপর পবিত্র কুরআনে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রতঙ্গের সম্পর্কে সূরা 'আস-সিজদা'-য় (৩২ ঃ ৯) বলা হয়েছে ঃ

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ

অর্থাৎ ঃ "তিনি তোমাদের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে তোমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় সৃষ্টি করে দিয়েছেন।"

এতে এমন কোনো কিছুই নেই যা আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের বিপরীত; বরং এ কথাই সত্য যে, পবিত্র কুরআনে কোথাও কোনো ক্রুটি ও ভ্রান্তির সন্ধান পাওয়া যায় না।

কুরআন ও বাইবেল

এবার আমরা অন্তিম বিষয়ে এসে গেছি। এ বিষয়টি হল কুরআনের ঐ বর্ণনার সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের তুলনা, বাইবেলে যা উল্লেখিত হয়েছে।

সৃষ্টিতত্ত্বের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে ইতিপূর্বেই বলেছিলাম যে, কুবআনের আয়াত এবং আধুনিক বিজ্ঞানের পরস্পরের মধ্যে ব্যাপক মতৈক্য লক্ষ্য করা যায়। আমরা একথাও বলেছিলাম যে, বাইবেলের মধ্যে

এমন অনেক কথাও আছে যা আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। এটা কোনো আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে, সৃষ্টি সম্পর্কিত যে বিবরণ বাইবেলে রয়েছে, তা খ্রিস্টপূর্ব ছ'শ বছরের পূর্বের পুরোহিতদের ধ্যান-ধারণারই প্রকাশ; পুরোহিতদের সমস্ত বক্তব্য এখান থেকেই গৃহীত হয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচারের সময় এ সব ধ্যান-ধারণা এক বিশেষ পদ্ধতিতে প্রচার করা হয়েছিল। এক নিশ্চিত লক্ষ্যকে সামনে রেখে এসব কথা প্রচার করা হয়েছিল। যেমন ফাদার ডি বারস (জেরুসালেমের বাইবিলিকল স্কুলের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ) বলেন, এর লক্ষ্য ছিল মূলত চরিত্র গঠনমূলক।

বাইবেলে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে আর একটি প্রাচীন তত্ত্বের (তথাকথিত ইহোভা-র বয়ান) সন্ধান পাওয়া যায়, যা এ বিষয়টিকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে থাকে।

এ দুই তত্ত্বই ওল্ড টেস্টামেন্ট বা প্রাচীন সংহিতায় বর্ণিত উৎপত্তি (জেনেসিস) তত্ত্ব থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ তওরাতের পূর্বেকার গ্রন্থ থেকে। হযরত মুসা আলাইহিস সালামের উপর অবতীর্ণ বলে মনে করা হয় কিন্তু বর্তমানে তা যে রূপে আমাদের হাতে এসেছে, তাতে কত পরিবর্তনই না সাধিত হয়েছে।

আদি গ্রন্থের (জেনেসিস) বিবরণ বংশানুক্রমিক বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যা আদম পর্যন্ত বিস্তৃত তা খুবই হাস্যাস্পদ, যা থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত টানা যায় না। তারপর যিশুখ্রিস্টের বংশানুক্রমিক বিবরণ সম্পর্কে ইঞ্জিলে, উদাহরণত মথি ও লুকের ন্যায় লেখকরা হুবহু নকল করেছেন। মথি এই বংশলতিকাকে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামও লুক আদম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত টেনে নিয়ে নিয়েছেন। এর সমস্ত বিবরণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে একেবারেই অসার; কেননা, তা পৃথিবীর আয়ু ও তার সময়কে নির্ধারণ করে, যখন পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল। বাইবেলে বর্ণিত পৃথিবীর আয়ু ও আদমের আবির্ভাব দুটি তথ্যই অসার বলে প্রমাণিত হয়েছে। এর বিপরীতে পবিত্র কুরআনে কোনো ভ্রান্ত মত ও তথ্যের অবতারণা করা হয়নি।

এর আগে আমরা সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সাথে পবিত্র কুরআনের মতৈক্য গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছি; অথচ বাইবেলীয়

সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণই এর বিপরীত : আলোর আবির্ভাব, পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে রাত ও দিনের উপস্থিতি, সৃষ্টির তৃতীয় দিবসে পৃথিবী এবং চতুর্থ দিবসে সূর্যের সৃষ্টি, পঞ্চম দিবসে আকাশে পাখিদের উড্ডয়ন এবং এরপরে ষষ্ঠ দিবসে জানোয়ারদের পৃথিবী পৃষ্ঠে সঞ্চারণ, এসব তত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। আর তা ঐ যুগেরই অন্ধবিশ্বাসের পরিণাম যা বাইবেলে লেখা হয়েছে। এর অন্য অর্থও গ্রহণযোগ্য নয়।

বাইবেলে বর্ণিত বংশলতিকাকে অবলম্বন করে ইহুদি ক্যালেন্ডার প্রণীত হয়েছে, যাতে দাবি করা হয়েছে পৃথিবীর বয়স ৫৭৩৮ বছর। একথা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। সৌরমণ্ডলের বয়স সম্ভবত সাড়ে চার হাজার কোটি বছর। এবং পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হয়েছে কমপক্ষে এক লক্ষ বছর পূর্বে।

সেজন্য এ একটি তাত্ত্বিক এবং অতীব মনোযোগের বিষয় যে, পবিত্র কুরআনে আয়ু এবং মহাকাশ প্রসঙ্গে যুক্তিবিরুদ্ধ কোনো বক্তব্য প্রকাশ করা হয়নি। যেখানে বাইবেলে তা সুনিশ্চিত শব্দাবলী প্রয়োগের মাধ্যমে উল্লেখিত হয়েছে। কুরআন এবং বাইবেলে বর্ণিত মহাপ্লাবন সম্পর্কে একটি তুলনামূলক আলোচনা এখানে করা যেতে পারে যা একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। বাস্তবিকই বাইবেলের বিবরণ দুটি বিবরণের একত্র সংযোজন, যা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণিত হয়েছে। বাইবেলে মহাপ্লাবনের কথা বলা হয়েছে, যা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের ৩০০ বছর আগে এসেছিল। হযরত ইব্রাহিম সম্পর্কে যতদূর জানা সম্ভব হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, খ্রিস্টপূর্ব ২১ বা ২২ শতাব্দীতে এই মহাপ্লাবন সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক বিচারে এ তথ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

একথা আমরা কিভাবে মেনে নিতে পারি যে, খ্রিস্টপূর্ব ২১ বা ২২ শতাব্দীতে এক মহা প্লাবন দ্বারা সমগ্র মানবসভ্যতা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল? অথচ উদাহরণত, আমরা জানি যে, সে সময়ে মিশরে একটি মধ্যকালীন রাজবংশ দেশ শাসন করছিল। এ ছিল প্রায় একাদশ রাজার রাজত্বকালের প্রাথমিক যুগ। এসব প্রচলিত ধ্যানধারণা আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুকূল নয়।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এক বিরাট ব্যবধান অনুমান করতে পারি, যা বাইবেল ও বাইবেলের বিপরীতে পবিত্র কুরআনে মহাপ্লাবন সম্পর্কে

বলা হয়েছে, তা কেবলমাত্র নূহ আলাইহিস সালামের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ঐ লোকেরা অন্যান্য অধার্মিক লোকদের ন্যায় শাস্তি ভোগ করেছিল। পবিত্র কুরআন মহাপ্লাবনের নিশ্চিত কোনো সময়ের কথা উল্লেখ করেনি। সেজন্য কুরআনের বর্ণনার উপর ঐতিহাসিক অথবা পুরাতাত্ত্বিক—কোনো দৃষ্টিতেই কোনো আক্ষেপের সুযোগ নেই।

তুলনার ক্ষেত্রে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দু হল হযরত মুসা আলাইহিস সালামের কাহিনী, বিশেষ করে যেখানে ইহুদিদের প্রসঙ্গ এসেছে, ফিরাউন যাদের দাস বানিয়ে রেখেছিল, যেটি পলায়নের সাথেও সম্পর্কিত।

এখানে আমি এ বিষয়ে গবেষণার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করব, আমার গ্রন্থে ইতিপূর্বে যা উল্লেখিত হয়েছে। আমি সে বিষয়টির প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ করেছি যেখানে কুরআন ও বাইবেলের মধ্যে পার্থক্য ও মতপার্থক্য দুই-ই পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণত, আমি যে স্থানটি পেয়েছি, সেখানে দুটি গ্রন্থই একে অন্যের পরিপূরক বলে সিদ্ধ হয়েছে। মিশরে ফিরাউনদের ইতিহাসে ইহুদিদের পলায়ন সম্পর্কিত বিষয়ে প্রচুর ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়, তা থেকে স্পষ্টই সিদ্ধও প্রমাণিত হয় যে, এ ছিল রামেসিস দ্বিতীয় (Merneptah Remessis) এর উত্তরাধিকারীর আমলের ঘটনা। ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত তথ্য ও পুরাতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে তা প্রমাণিত। এ জন্য আমি যারপরনাই আনন্দের সাথে একথা ঘোষণা করছি যে, বাইবেল বর্ণিত প্রমাণ আমাদের কাছে ফেরাউন ও মুসার (আঃ) সময়কালকে নিশ্চিত রূপে বুঝতে ব্যাপকভাবে সাহায্য করে। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম দ্বিতীয় রামেসিসের আমলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বাইবেলের এ তথ্য মুসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বলে বিবেচনার দাবি রাখে।

তারপর পানিতে ডুবে মৃত অথচ সুরক্ষিত মৃতদেহটি সম্পর্কে ডাক্তারি গবেষণার মাধ্যমে তার বিনষ্ট না হওয়ার কারণ সম্পর্কে কিছু সম্ভাব্য তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

ফিরাউনের এই মৃতদেহটি আমরা পেয়েছি। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে তার সন্ধান পাওয়া যায়। এ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বাইবেল বলে যে সে সমুদ্রে ডুবে মরেছিল।

কিন্তু তার লাশ কী হল? এ ব্যাপারে সে কিছু জানায়নি। পবিত্র কুরআনে 'সূরা ইউনুস' (১০ ঃ ৯২)- বলছে, সে ধ্বংস হয়েছে, তার মৃতদেহ পানি থেকে সুরক্ষিত করা হল ঃ

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ *

অর্থাৎ ঃ "আজ আমরা তোমার মৃতদেহকে সুরক্ষিত করে নিলাম যাতে পরবর্তীদের জন্য তা উদাহরণ হয়ে থাকে।"

এই মৃতদেহের ডাক্তারি পরীক্ষার পরে জানা গেছে যে, পানিতে তা বেশি সময় যাবৎ ডুবে থাকেনি, কেননা, বেশিক্ষণ ডুবে থাকলে মৃতদেহ বিকৃত হয়ে যায়। কিন্তু সে দেহে বিকৃতির কোনো লক্ষণ স্পষ্ট নয়।

এখানেও আধুনিক তথ্যের আধারে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে কুরআনের বয়ানের কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

ওল্ড টেস্টামেন্ট (প্রাচীন গ্রন্থ বা সংহিতা) সাহিত্যিক রচনার একটা সংকলন। যা প্রায় ন' শ বছরে পূর্ণতা লাভ করে। বাইবেলের মূল রচনায় মানুষের অনেক হাতেরই চিহ্ন রয়েছে, তা গভীর মনোযোগের বিষয়।

কুরআন অবতরণের ইতিহাস এ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে মুহূর্তে তা অবতীর্ণ হয়েছে, তৎক্ষণাৎ তা কণ্ঠস্থ করে নেওয়া হয়েছে এবং স্বয়ং মহানবী হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবৎকালেই তা লিখে রাখা হয়েছিল, সেই থেকে আজ পর্যন্ত পবিত্র কুরআনে সামান্যতম রদবদলও সম্ভব হয়নি।

আধুনিক জ্ঞানের আলোকে পবিত্র কুরআনের নিরপেক্ষ অধ্যয়নের ফলে আমরা পরস্পরের মধ্যে গভীর মতৈক্য দেখতে পাই— ইতিপূর্বে সেকথা আমরা উল্লেখ করেছি। সে কারণে এ কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না যে, হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ের কোনো মানুষ তার প্রাপ্ত জ্ঞানের উপর নির্ভর করে এসব বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। আধুনিক তথ্যাবলীর সন্ধান তো সে যুগে এভাবে পাওয়া সম্ভব ছিল না।

এ সব কারণে পবিত্র কুরআনের স্থান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, বেজোড় (Unique) বলে প্রতীয়মান হয়েছে; এবং নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, তিনি এর কোনো বিশুদ্ধ ভৌতিকতাবাদী কারণ ও আধার প্রস্তুত করতে একেবারেই অসমর্থ।

‘অহী’র (Revelation) আলো

পরিচয়

জীবন কী?

জগতে মানুষের অস্তিত্ব তথা সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা— একে প্রকৃতির আশীর্বাদ বলেও অভিহিত করা যেতে পারে। সৃষ্টির প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা সর্বশক্তিমান, দয়ালু ও পবিত্র এক স্রষ্টার সম্পর্ক গভীরভাবে অনুভব করি। স্রষ্টা বা কর্তা ছাড়া কর্ম বা কোনো কিছুরই সৃষ্টি সম্ভব নয়। প্রতিটি আত্মাই জানে যে, তিনি আছেন এবং তার অস্তিত্ব সেই পরম স্রষ্টার উপর নির্ভরশীল। সে একথাও জানে যে, সে নিজেকে সৃষ্টি করতে পারে না। সে জন্য তার সৃষ্টিকর্তাকে জানাটা তার জন্য অবশ্যকর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

মানবজাতি

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। আল্লাহ তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধিরূপে তাঁর অন্য সব সৃষ্টি ও জীবকুলের উপর তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ বিবেকসম্পন্ন এক বুদ্ধিমান জীব। তার এই বিশেষত্ব তাকে আর সমগ্র জীবের থেকে পৃথক করে রেখেছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—‘আল্লাহ বিবেক এবং বুদ্ধির চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছু সৃষ্টি করেননি। অথবা বিবেকের চেয়ে পূর্ণাঙ্গ এবং শ্রেষ্ঠ আর কোনো কিছু তিনি সৃষ্টি করেননি----।’ জ্ঞান এবং বিবেচনা শক্তির সাথে সাথে মানুষকে বুদ্ধির স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, যাতে তার জীবনের চলার সঠিক পথ বেছে নিয়ে আল্লাহর প্রতিনিধিরূপে নিজের পরিচয়কে ঠিক রাখতে পারে; নইলে নিম্নশ্রেণীর জীব ও পশুপাখি থেকে তাকে আলাদা করে চেনা যেত না। মানুষ পবিত্র এবং নির্দোষ সৃষ্টি। তাকে ভালো এবং মন্দ, পাপ বা পুণ্য যে কোনো কাজই করার স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে।

আল্লাহর পথ

প্রতিটি মানুষের জন্যই আল্লাহর অপার প্রেম ও দয়ার পথ উন্মুক্ত রয়েছে। সেই সঠিক পথ চিনে নেওয়ার জন্য মানুষকে অন্ধকারে ছেড়ে দেওয়া হয়নি। কেবলমাত্র একটু চেষ্টা বা পরিশ্রম করলেই অর্থাৎ নিজেদের পাপ এবং ভুলত্রুটিকে সংশোধন করার চেষ্টা করলেই সে পথের সন্ধান লাভ সম্ভব। ভাবনা-চিন্তা করার ক্ষমতা প্রদানের সাথে সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের আল্লাহর পথের দিশাও দেখানো হয়েছে—যা আমাদের কাছে সত্য ও জ্ঞানের সিদ্ধান্ত প্রকট করে এবং ইহকাল ও পরকালেও আমাদের অস্তিত্বের যথার্থতা বিষয়ে সঠিক আলোর সন্ধান দেয়।

আল্লাহর প্রকাশ

মানব জাতির উৎপত্তি ও তার বিকাশের প্রারম্ভিক কালেই আল্লাহ যুগে যুগে নবী রসূলদের প্রেরণ করেছেন তাদের হেদায়েত বা সুফল প্রদর্শনের জন্য যাতে পৃথিবীতে আল্লাহর আদেশ ও নির্দেশ পালনের মাধ্যমে মানুষ সঠিক ও সত্যপথে চলতে পারে। এই-ই "ইসলাম" আল্লাহর নবী ও রসূলেরা যুগ যুগ ধরে আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌছে দিয়ে গিয়েছেন। সমস্ত নবী-রসূলই মানবজাতিকে একই পথের প্রতি আহবান জানিয়ে গেছেন।

আল্লাহর প্রেরিত প্রথম দিককার এসব পয়গাম পরবর্তী প্রজন্মগুলোর হাতে চরমভাবে বিকৃত হতে হতে তাতে অন্ধবিশ্বাস, মূর্তিপূজা তথা অগণিত অসঙ্গত ও ভ্রান্ত দার্শনিক মতবাদের সমাবেশের কারণে তা দূষিত ও কলুষিত হয়ে পড়েছে। ঐশ্বরীয় ধর্ম আরো অগণিত মনগড়া ধর্মের বাহুল্য দ্বারা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। মানবজাতির ইতিহাস বাস্তবিকই আলো ও অন্ধকারের দ্বন্দ্বে দীর্ণ এক ধারাবাহিক ইতিহাস কিন্তু মানবজাতির প্রতি অপার ভালোবাসা ও করুণার কারণে আল্লাহ আমাদের পরিত্যাগ করেননি।

শেষ আলো

যখন মানবজাতি অন্ধকার যুগের গহ্বরে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছিল, তখন আল্লাহ তাঁর শেষ বাণীবাহক, পয়গাম্বর হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামকে মুনষ্যত্ব ও মানবতার উদ্ধারের জন্য পৃথিবীতে পাঠালেন। তিনিই মানবজাতির জন্য সর্বশেষ ও চিরস্থায়ী পথ প্রদর্শক।

সত্যের মানদণ্ড

একথা আমরা কিভাবে জানব যে, ওহী (Revelation) বা ঐশ্বরিক আলোর প্রকাশ কুরআন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর বাণী? সত্যের এ মানদণ্ড দিয়ে এ সত্য স্পষ্টভাবে যে কোনো ব্যক্তির পক্ষেই বুঝে নেওয়া সম্ভব।

১। **বুদ্ধিগ্রাহ্য শিক্ষাবলী ঃ** যেহেতু আল্লাহ মানুষকে বোধ এবং বুদ্ধি দুইই প্রদান করেছেন, সেহেতু আমাদের কর্তব্য যে, তারই সাহায্যে সত্য ও অসত্যের মধ্যেকার পার্থক্যকে নিরূপণ করা। অবিকৃত ও সত্য ঐশ্বরিক বাণী একেবারেই বুদ্ধিগ্রাহ্য হওয়া উচিত, এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে তা বোঝা উচিত।

২। **পূর্ণত্ব ঃ** আল্লাহ পরিপূর্ণ সত্তা। সেজন্য তাঁর বাণী পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণরূপে নির্মল হওয়া উচিত। তারপর এমনটি কখনোই হওয়া উচিত নয় যে, তাতে কোনো অসঙ্গতির আভাস থাকতে পারে। এবং তাতে পরস্পরের মধ্যে কোনো অমিল থাকবে না। তা সম্পূর্ণরূপে বিরোধাভাসমুক্ত হওয়া উচিত।

৩। **অসঙ্গত পরিকল্পনা ও অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত ঃ** সত্য ঐশ্বরিক বাণী অসঙ্গত বক্তব্য ও অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত হবে। কেননা, এ ধরনের বস্তু গৌরব, ঈশ্বর ও মানবীয় মূল্যবোধের পরিপন্থী।

৪। **বিজ্ঞান সম্মত ঃ** যেহেতু ঈশ্বর সমস্ত জ্ঞানের স্রষ্টা, সেহেতু সত্য ঐশ্বরিক বাণীকে অনিবার্যভাবে বিজ্ঞানসম্মত হতে হবে এবং তার এমন ক্ষমতা থাকবে যে, সে যে কোনো বৈজ্ঞানিক সত্য ও তথ্যের মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে।

৫। **ভবিষ্যদ্বাণী ঃ** ঈশ্বর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী, সে জন্য তার প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্যই পুরো হবে।

৬। **মানুষের পক্ষে নকল করা সম্ভব হবে না ঃ** ঈশ্বরের সত্যবাণী

ভ্রমাতীত এবং তা অসফলতার উর্ধ্বে। তা নকল করা এবং তার সমকক্ষ কোনো কিছু সৃষ্টি করা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। ঈশ্বরের সত্যবাণী এক জীবন্ত মোজেজা। তা এক প্রকাশ্য গ্রন্থ, যা মানুষকে অবলোকন করার আহবান জানায় এবং তা পরীক্ষার মাধ্যমে তার সততা নিরীক্ষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে বলে তা ঠিক না বেঠিক।

প্রিয় পাঠকদের উদ্দেশে

'সত্য'-কে স্বীকার জন্য মানুষ বাধ্য নয় কিন্তু তা বিস্ময়কর মানব-প্রতিভা এবং বুদ্ধির জন্য এক লজ্জাজনক ব্যাপার যে, সত্য সন্ধানের প্রতি সে কোনো আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করে না।

ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহ মানুষকে বিচার-বিবেচনার শক্তি দান করেছেন, সেজন্য মানুষের প্রতি তিনি আশা করেন যে, সে নিরপেক্ষভাবে বিধিসম্মত এবং সুব্যবস্থিতভাবে তা বোঝার চেষ্টা করবে। এ সম্পর্কে সে এ পদ্ধতি অবলম্বন করবে এবং চিন্তন ও মননের সাহায্যে তা বিচার করবে। এ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করবে এবং গভীর চিন্তা-ভাবনার পরে সে তার ফল ল্যাভের চেষ্টা করবে। (বার বার ভুল করে তা থেকে শিক্ষা নিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে পিছপা হবে না)।

এটা কখনোই ঠিক হবে না যে, কোনো ব্যক্তি এমন দাবি করল যে, ইসলামের কোনো শিক্ষা গ্রহণের সাথে সাথেই যে কোন সমস্যার ত্বরিত সমাধান হয়ে যাবে। এটাই তো ইসলামের শিক্ষা যে, লোকেদের স্বাধীন চিন্তাভাবনার অধিকার থাকা উচিত যাতে সে ইচ্ছামতো কোনো কিছু নির্বাচন করে; বরং ইসলাম মানুষকে এ স্বাধীনতা পর্যন্ত দিয়েছে যে, সত্য কোনো মানুষের উপর প্রকট হওয়ার পরেও তা গ্রহণ বা বর্জনের ব্যাপারে তার স্বাধীনতাই চূড়ান্ত।

কিন্তু ইসলামের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত ও মতবাদ সৃষ্টির পূর্বে আপনি নিজের কাছে এ প্রশ্ন করুন যে, আপনি কি এ বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান লাভ করেছেন? আপনি নিজেকে প্রশ্ন করুন যে, যদি তা না হয় যে, ইসলাম বিষয়ে যে জ্ঞান আপনি লাভ করেছেন তা আপনি তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে অর্থাৎ অমুসলিমদের কাছ থেকে তা লাভ করেছেন। এরকম অমুসলিমদের

কাছে ইসলামী সাহিত্যের জ্ঞান আজও ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে যাওয়াটাই সম্ভব; সেজন্য ইসলামী জ্ঞান ও ধ্যানধারণা সম্পর্কে নিরপেক্ষও সুবস্থিতভাবে অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান তাদের জন্য খুবই প্রয়োজন।

এটা কি কখনো সম্ভব যে, একজন পাচক একটি সুখাদ্য প্রস্তুত করেছে; তার স্বাদ তার কাছ থেকে না জেনে অন্যের কাছ থেকে শুনে তা লাভ করা? বলাবাহুল্য, যে কোনো বস্তুর স্বাদ নিজে না চেখে তা অনুভব করা সম্ভব নয়। ঠিক এভাবেই একজন বিশ্বাসী ব্যক্তির কাছ থেকেই ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করা উচিত। শুধু তাই নয়, ইসলাম সম্পর্কে এটাও মনে রাখতে হবে যে, সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হলে শুধু চেখে ছেড়ে দেবেন; বরং এটাও আবশ্যক যে, তা হজম করতে হবে এবং ভালোমতো তার সম্পূর্ণ নিজের সবকিছুর সাথে মিশিয়ে নিতে হবে। ইসলামকে বোঝার সবচাইতে যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি হচ্ছে এটাই।

এটা আপনার উপরেই নির্ভর করছে যে, এর পরবর্তী পদক্ষেপ আপনি কিভাবে নেবেন।

প্রত্যেক মানুষেরই একটি নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি রয়েছে। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ আপনাকে আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে পারে না। সত্যের সন্ধানে তাকে নিজেই ব্রতী হতে হবে এবং নিজেকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, এই প্রকাশ্য সত্যের প্রতি আপনি কী নীতি অবলম্বন করবেন।

সমাপ্ত